ISSN 0971-5800
জুলাই, ২০০৯

উৎস মানুষ

Putting a smile on students' faces
Specially designed scheme to make students' dreams come true and to further their plans of higher studies.
Maximum loan limit
Up to Rs 7.5 lakhs for study in India.
Upto Rs 15 lakhs for study abroad.
Repayment period
5 to 7 years
Rate of Interest
Attractive
Margin
Above Rs 4 lakhs, 5% for studies in India. 15% for studies abroad.
United
EDUCATION
LOAN
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
United Bank of India
Wholly owned by Govt. of India

২৯ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • জুলাই ২০০৯

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	২
মাউন্ট এভারেস্ট, নাকি রাধাচূড়া	আশীষ লাহিড়ী	৪
বই-নথি-পত্র সংরক্ষণ : কীভাবে	সুবীরকুমার সেন	৭
সানস্ক্রিন ক্রিম: রোদ ঠেকানো না লোক-ঠকানো দাওয়াই	জয়ন্ত দাস	১০
জঙ্গল ঘিরে দেওয়ার জন্যই কি সুন্দরবনের বাঘ গ্রামমুখী	বিজন ভট্টাচার্য	১২
গণপতি চক্রবর্তী : এক অবহেলিত জাদুকর	সমীরকুমার ঘোষ	১৪
সূর্যগ্রহণ দেখার সুযোগ একদম ছাড়বেন না	অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
ক্যানসার : সাবধানের মার নেই	উৎপল সান্যাল	১৯
রোগের বালাই নেই, উপসর্গের রমরম	জ্যোতির্ময় সমাজদার	২৩
স্বজন- বিয়োগ		২৬
সংগঠন সংবাদ		২৮

অক্ষর বিন্যাস : ঝিল্লি বানার্জি, জয়ন্ত দত্ত, সুবীর ঘোষ

উৎস মানুষ
ISSN 0971 - 5800
বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪
ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০১৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/২৫৩১ ০৯১৩
ই-মেল: jhilly_banerjee@yahoo.co.in
ওয়েব সাইট: www.utsamanush.com

আমাদের কথা

অশোকদার প্রয়াণের পরই যে প্রশ্নটা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা হল — উৎস মানুষ পত্রিকার কী হবে? এবার সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল! কে আছে চালাবে! এটা ঠিক, উৎস মানুষের চালিকাশক্তি ছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-চারজনকে নিয়েও জারি রেখেছিল অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। তার হঠাৎ-মৃত্যু বিহ্বল করে তুলেছিল সহযোদ্ধাদের। ব্যক্তির গুরুত্ব স্বীকার করলেও উৎস মানুষ ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নয়, তাই সাময়িক বিহ্বলতা কাটিয়ে বইমেলায় স্টল দিয়েছে। হঠাৎ-সিদ্ধান্তে তড়িঘড়ি ধারধোর করে প্রকাশ করেছে 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা।' মেলায় পুরনো বইপত্র বিক্রি হয়েছে ভালই। গ্রাহক-শুভানুধ্যায়ী যাঁরাই এসেছেন, বারবার একটা অনুরোধই করেছেন — দেখবেন, পত্রিকা যেন একদম বন্ধ না হয়। নতুন বই ছাপুন, পুনর্মুদ্রণ করুন বইগুলোর। কেউ কেউ অশোকদার জীবনী প্রকাশের প্রস্তাবও দিয়েছেন। সবার মোদ্দা কথা ছিল — এমন উদ্যোগকে শেষ হতে দেবেন না, এখনও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। উৎস মানুষের প্রতি এই ভালবাসা, টান আমাদের আপ্লুত করেছে, যেমন করত অশোকদাকে। আমরা তাই ঠিক করেছি, সবার এই চাওয়াকে সম্মান জানাব। যে করেই হোক দু তিন মাস অন্তরও প্রকাশ করব পত্রিকা, বইও ছাপাব। জানি এমন ইচ্ছার কথা শুনে কেউ কেউ বাঁকা হাসবেন। অশোকদার জুতোয় পা গলানোর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নও তুলবেন। তুলুন। আমরা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারব না, চাই-ও না। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য ও বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে লড়াইটা জারি রাখতে চাই। রবীন্দ্রনাথ 'কর্তব্যগ্রহণ'-এ লিখেছিলেন — 'কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি —/শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। /মাটির প্রদীপ ছিল; সে কহিল স্বামী, /আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

অগণিত পাঠকবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী পাশে আছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস — উৎস মানুষ আছে, থাকবে।

আহরণ

স্পিরিচুয়ালিজম বা প্রেততত্ত্ব

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে অনেকে আমাদের নিকট মাঝে মাঝে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি জনৈক উৎসাহী পাঠক লিখিয়াছেন যে, এক সময়ে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে নাকি লোকের খুবই উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। অনেকের বাড়ীতেই সিয়ান্স বসিত এবং মেসমেরিজম, হিপ্‌নটিজম, মিডিয়াম, টেবিল-চালনা, প্ল্যানচেট প্রভৃতির প্রবল চর্চা হইত। কিন্তু বর্তমানে এসব ব্যাপারের কোন চর্চা দেখা যায় না কেন? এসব ব্যাপার কি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে?

এই সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অজানা যে কোন রহস্য উদ্ভেদের জন্য আলোচনা, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, যদি তাহা বৈজ্ঞানিক রীতিতে অনুসৃত হয়। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত ধারণা আবহমান কাল প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক হইতে বিংশ শতকের প্রথম দিকে কয়েক দশক পর্যন্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈব চৌম্বক-শক্তি, মেসমেরিজম্, ও হিপ্‌নটিজম্ প্রভৃতি ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে একটা নূতন ধারায় প্রবলভাবেই আলোচনা এবং অনুশীলন চলিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে এই উৎসাহ ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিল, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভূত, প্রেত বা ওইরূপ কোন অলৌকিক জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা — এই প্রশ্নের উত্তরে একমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ওইরূপ কোন অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। বহু খ্যাতনামা লোক ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বলিয়াই উহাদের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হয় না। তাঁহাদের বিশ্বাসও কোন যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তির সততা বা পদমর্যাদার দোহাই দিয়াই বিশ্বাসীরা তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চাহেন। অতিপ্রাকৃত জীব আছে, পরলোক আছে, পাপপুণ্য-স্বর্গ-নরক আছে — এই কথা শুধু বিশ্বাস করিতে বলিলেই কেহ বিশ্বাস করিবে না — বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মানুষ যেমনভাবে গ্রহণ করে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ফলও তেমনভাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই বিষয়ে সেরূপ কোন প্রমাণ তো নাই-ই, অধিকন্তু যাঁহারা অতি প্রকৃত ভূত, প্রেত প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কত শিথিল, সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিব।

1848 খৃস্টাব্দে নিউইয়র্কের কেটি ফক্স ও মার্গারেটা ফক্স নামে 15 ও 12 বৎসর বয়স্কা দুইটি কৃষক বালিকার দ্বারা অতি প্রাকৃত জীবনের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক অভিনব ধারায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাহারা যেখানে যাইত সেইখানেই কোন অদৃশ্য স্থান হইতে অদ্ভুত একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে পারিত। অনেক দিন পর্যন্ত কেহই এই শব্দোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ফক্স ভগিনীরা কিন্তু ইহাকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু 1850 খৃস্টাব্দে নিউইয়র্কের বাফেলো সহরে এই ভৌতিক শক্তির পরিচয় দিতে গিয়া তাহারা ধরা পড়ে — শব্দ তাহাদের নিজেদের জানুসন্ধির স্থানচ্যুতি সংঘটনে উৎপন্ন করা হইত। সোফায় বসিয়া মেঝের উপর পা রাখিলেই প্রেতের আবির্ভাবে বিলম্ব হইত না। কিন্তু যখন চেয়ারে বসাইয়া মেঝের উপর কিংবা পায়ের উপর পা রাখিতে না দিয়া কেমল পরির উপর পা রাখিতে দেওয়া হইত, তখন আর প্রেতের সাড়া পাওয়া যাইত না। উহাদের পা চাপিয়া ধরিলেও প্রেত সাড়া দিতে অসমর্থ হইত। ফক্স ভগীদের প্রতারণা যে শুধু এই ভাবেই ধরা পড়িল তাহা নহে — 1888 খৃস্টাব্দে মিসেস কেন (বিবাহিতা মার্গারেটা ফক্স) এবং মিসেস জেনকেন (বিবাহিতা কেটি ফক্স) নিজেরাই প্রকাশ করিয়া দেন যে শব্দ উৎপাদন বুজরুকি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, কি উপায়ে শব্দ উৎপাদন করা হইত, মিসেস কেন নিজেই তাহা সকলকে দেখাইয়া দেন।

এই ফক্স ভগীদের দৃষ্টান্তে উত্তরকালে অসংখ্য মিডিয়াম বা প্রেতবার্তাগ্রাহীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ডি. ডি. হোম, ইউসেপিয়া প্যালাডিনো; ফ্লোরি কুক, মাডাম ব্লাভাটস্কি, হেনরি স্লেড ও হোসেন খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ডি. ডি. হোমকেই কখনও ধরা পড়িতে শোনা যায় নাই। ইহার ধরা না পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, ইহার কার্যকলাপ সন্দেহের চক্ষে দেখিলে ইনি কখনও শক্তির পরিচয় দিতে রাজী হইতেন না।

ইউসেপিয়া প্যালাডিনো নাম্নী ইটালিয়ান কৃষক বালিকার নিকট এত অধিক সংখ্যক বিজ্ঞলোক হার মানিয়াছেন যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কিন্তু ফাঁকি চিরকাল চলিতে পারে না। 1909 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মুন্সটারবার্গ ও মিঃ কেরিংটন একযোগে তাহার চাতুরী ধরিয়া ফেলেন। তাঁহারা পূর্বাহ্নেই পরীক্ষাগৃহে একজন লোককে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইউসেপিয়া পাদুকার ভিতর হইতে সুকৌশলে একখানি পা বাহির করিয়া তাহার সহায্যে অসামান্য দক্ষতার সহিত ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া লোককে বিস্মিত করিত। ইউসেপিয়া পায়ের সাহায্যে প্রেতের কার্যগুলি করিয়া যাইতেছে — লুক্কায়িত লোকটি ইহা দেখিতে পাইয়া তাহার পাদুকাশূন্য পাখানি জোড়ে চাপিয়া ধরায় সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়া দেওয়ায় তাহার বুজরুকি ধরা পড়িয়া যায়।

ফ্লোরী কুক-এর প্রভাবে কেটি নাম্নী জনৈকা মৃতা রমণী শরীরিণী হইয়া সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইত। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ 1874 খৃস্টাব্দে 29শে মার্চ তারিখের একটি ভৌতিক বৈঠকে (Seance) কেটির প্রেতাত্মা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন — কেটির প্রেতাত্মা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কক্ষের মধ্যে পরিভ্রমন করিতে করিতে পরিচিতের ন্যায়সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। চলিতে চলিতে অনেকবার সে আমার বাহু ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে আমার

মাডাম ব্লাভাটস্কির নাম এদেশে সুপরিচিত। তিনি 1875 খৃস্টাব্দে কর্নেল অলকটের সহায়তায় নিউইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। 1882 খৃস্টাব্দে ওই সমিতি-গৃহ মাদ্রাজের আডিয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। আডিয়ারে সমিতি-গৃহে নানারূপ অলৌকিক কার্য সাধিত হয় বলিয়া এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। লন্ডনের Society for Psychical Research এই ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য মিঃ আর, হডসনকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির চাতুরী ধরা পড়িয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির সাহায্যকারিণী মিসেস কোলম ফাঁকি সংক্রান্ত উপদেশপূর্ণ ম্যাডামের স্বহস্তলিখিত বহু পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে Isis very much unveiled এবং The frauds of Theosophy Exposed নামক পুস্তকগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। হেনরী স্লেডের শক্তির প্রভাবে প্রেতাত্মারা তাহার স্লেটে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিত। এই উপায়ে এক সময়ে বহু অর্থোপার্জন করিলেও অবশেষে ধরা পড়িয়া শেষ জীবনে তাহাকে কর্পর্দকহীন অবস্থায় অতি কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

এদেশের হোসেন খাঁর কথা অনেকেরই জানা আছে। তিনি জিন বা পিশাচ-সিদ্ধ ছিলেন। জিনের সাহায্যে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। হুতোম পাঁচার নক্সা ও অন্যান্য পুস্তকে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমাগত কয়েক স্থানে বুজরুকি ধরা পড়িবার পর অবশেষে তাঁহাকে শ্রীঘর বাস করিতে হইয়াছিল।

এই সকল প্রেতবার্তাগ্রহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কতদূর সঙ্গত ভূত, প্রেত প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার প্রেতের ফটো তোলা যাইতে পারে, এরূপ গল্প হয়তো অনেকেরই জানা আছে। মিঃ মামলার নামে এক ব্যক্তি এরূপ ফটো তুলিয়া অর্থোপার্জন করিত। নিউইয়র্কে আসিয়া তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া যায়। মীর হামিদ নামে একজন পাঞ্জাবী কলিকাতায় এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিত। কিন্তু তাহার চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা জানেন — কিরূপে Double exposure অথবা দুইখানি নেগেটিভ উপর্যুপরি রাখিয়া কত সহজে ভূত-প্রেতের ছবি তোলা যাইতে পারে।

টেবিল-চালনা দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়, এই বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এক সময়ে টেবিল চালনার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফারাডে যন্ত্রের সাহায্যে অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিয়া দেন যে, টেবিল-চালনার সময় যাহারা টেবিলের উপর হাত রাখে তাহারাই অজ্ঞাতসারে টেবিল নাড়িয়া থাকে।

Spiritualism, The Inside Truth নামক পুস্তকে ফ্লোরেন্স মেরিয়াট নাম্নী একটি মহিলার প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিবরণে ইহাদের প্রতারণার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, এ হেন প্রেততত্ত্বে অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিতও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে সকল যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা শুনিলে হাসি পায়। তখন যে সকল পণ্ডিত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে সার অলিভার লজই বিশেষ খ্যাতসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার Raymond, or Life and Death নামক পুস্তকে প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রেমণ্ডর প্রেতাত্মা আনয়ন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধির একান্ত সরলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। মোট কথা, যে সকল পরীক্ষায় প্রতারণা চলিতে পারে, শুধু সেই সকল পরীক্ষাতেই প্রেতের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যে সকল পরীক্ষায় প্রতারণার সুযোগ নাই, সেই সকল পরীক্ষায় তথাকথিত প্রেতের যে অস্তিত্ব নাই, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে একটি সহজ সরল কথা এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি একটু গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিলে সহজেই প্রতীত হয় — জীবন হইতে জীবনের উৎপত্তি হইতেছে, এবং এই জীবন প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। কোথাও একটু ফাঁক নাই। জীবনপ্রবাহ যদি অবিচ্ছিন্নই হয় তবে দেহাতিরিক্ত কোন অতিপ্রাকৃত প্রেতযোনির জন্মান্তর পরিগ্রহের সম্ভাবনাও থাকে না। কাজেই এইরূপ বিশ্বাসের মূল ভিত্তিতেই টান পড়ে।

লেখাটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরক সংখ্যা' নভেম্বর ১৯৮১ থেকে নেওয়া। তবে লেখাটি প্রথম ছাপা হয় ওই পত্রিকাতেই ১৯৫৮ সালে।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা

প্রতি বছর প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে উৎস মানুষ পত্রিকা গোষ্ঠীর। এ বছরের, অর্থাৎ প্রথম বার্ষিক সেই স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হবে নভেম্বর মাসে কলকাতায়। পাঠকবন্ধুদের সবান্ধব উপস্থিতি আশা করি। পুনঃ, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু লেখা উৎস মানুষ-এর বাইরেও ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায়। রয়েছে অনেক বেতার কথিকাও। আমরা সে সব নিয়ে এক সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশেও তৎপর। এ বিষয়ে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহৃদয় সহযোগিতা আবশ্যক। কারও সন্ধানে তেমন লেখা থাকলে তার প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।

মাউন্ট এভারেস্ট, নাকি রাধাচূড়া?

আশীষ লাহিড়ী

রমজান খান বলেন, 'বাঙালী আপন দেশে ব'সে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চূড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাৎলে দেয়নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমেদ আলি শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, হুঁ, কিন্তু একটু টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যর জর্জ লণ্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা ...'

পুরো পাঠান আর নিম পাঠান এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। 'তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? ...'

— সৈয়দ মুজতবা আলি (দেশে বিদেশে, ১৯৫৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৪)

জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ার শিকদাররা ছিল পুরুষানুক্রমে পুলিশ। একদিকে ব্রাহ্মণ, ওদিকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ! সেই নবাবি আমল থেকে এই ব্যবস্থা চলে আসছিল। তাদের বংশে সবারই চেহারা ছিল পালোয়ানের মতো। অধীনে থাকত পাইক, বরকন্দাজ, সেপাইদের মস্ত বাহিনী। শিকদারদের দেখলে সাহেব-নেটিবে একসঙ্গে সেলাম ঠুকত। সাহেব কোম্পানির লোকেরাও জোড়াসাঁকোর শিকদার-বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় টুপি খুলে সম্মান জানাতে বাধ্য হত।

কিন্তু হাতে নিরঙ্কুশ ডাণ্ডা থাকলেই তার অপব্যবহার হবে। এক্ষেত্রেও তাই হল। চোর-ডাকাত না ধরে শিকদাররা ভাল লোকেদের ধরতে লাগল, মারধর করতে লাগল। সাহেব কোম্পানি অবশেষে শিকদারদের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিল। এতদিনকার নবাবি বোলবোলাও সব এবার ঠাণ্ডা। অন্য কোনো কাজকর্মও জানে না তারা। ফলে অবস্থা ঝপ ঝপ করে পড়তে লাগল।

এই রকম পড়ন্ত অবস্থায় ১৮১৩ সালে তিতুরাম শিকদারের একটি ছেলে হল। তিনি নাম রাখলেন রাধানাথ। তিতুরাম শিকদার, শিকদার হলেও, অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই ভাবলেন, ছেলেটাকে অল্পবিস্তর ইংরেজি, লেখা, জেতি ওড শিখিয়ে একটা সওদাগরি কোম্পানিতে দশ/বিশ টাকা মাইনের কেরানির কাজে জুতে দিতে পারলেই ঢের। বাড়ির কাছে জোড়াসাঁকোতেই ছিল 'ফিরিঙ্গি' কমল বোসের স্কুল। সেইখানে ভর্তি হল রাধানাথ। কিন্তু তিতুরামের মনে হল, আরেকটু ভালো ইংরিজি শেখা দরকার, তাহলে আরেকটু ভালো চাকরি পেতে সুবিধে হবে।

তখনকার দিনে চোস্ত ইংরিজি শেখার একটিই জায়গা ছিল — হিন্দু কলেজ, যার এখনকার নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেটা গড়ে উঠেছে সবেমাত্র ১৮১৭ সালে। ১৮২৪ সালে এগারো বছরের রাধানাথকে সেখানেই ভর্তি করে দিলেন তিতুরাম। রাধানাথ প্রত্যেকটা বিষয়ে এমন দুর্দান্ত ফল করল যে বাবা তাজ্জব। ছেলের এত মাথা! তখন তিনি ঠিক করলেন, এমন মেধাবী ছাত্রকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনাটা উচিত হবে না। বরং ও লেখাপড়াই করুক। বাবা নাহয় আরো কিছুদিন কষ্ট করেই সংসারটা চালাবেন।

পড়াশুনো ভালোই চলছিল, কিন্তু উৎপাত বাধালেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) নামে একটি লোক — লোক না বলে ছেলে বলাই ভালো। মাত্র একুশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে মাস্টারমশাই হয়ে ঢোকেন তিনি। যেমন ইংরিজি জানেন, তেমনি গ্রীক, ল্যাটিন, দর্শন, ইতিহাস। অসাধারণ কবিতা লেখেন ইংরিজিতে। সবই ভালো, কেবল মুশকিল একটাই। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শেখাতে লাগলেন, দেখো, জ্ঞান অর্জনের একটাই উদ্দেশ্য — নিজের অন্তরকে জাগানো। প্রচুর বই পড়ো, যা ইচ্ছে হয় তাই নিয়ে তর্ক করো, কিন্তু মনে রেখো, বুদ্ধিটা তোমায় নিজেকেই খাটাতে হবে। কাউকে মানবে না। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, যুক্তি যা বলবে, তাই করবে। তাতে যদি ভুল হয়, কুছ পরোয়া নেই, ভুল শুধরে নেবে।

এমন লাই পেয়ে ছাত্ররা ঠিক করল যে তারা সমাজের বাঁধা নিয়মকানুন কিছুই মানবে না। তারা বলতে লাগল : সব মানুষ সমান, গায়ের রঙ দিয়ে মানুষের বিচার হয় না, জাতপাতের কোনো মানে নেই, ধর্মের কোনো মানে নেই, ধর্মে-ধর্মে ভেদেরও কোনো মানে নেই, ভগবান-টগবান সব বুজরুকি, খাদ্যাখাদ্যের বাছাবাছি বিচার অর্থহীন। কিছু কিছু বাড়াবাড়িও করল, যেমন ছেলে ছোকরারা করে আর কি!

ব্যস, বাবা-মায়েরা সব খেপে উঠলেন ডিরোজিওর ওপর : 'আপনার পাল্লায় পড়ে আমাদের সুবোধ বালকেরা সব গোল্লায় যাচ্ছে।' শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হল ডিরোজিওকে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্যোগী ছিলেন দেওয়ান রামকমল সেন, কেশব সেনের ঠাকুরদা। হিন্দু কলেজ থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত ডিরোজিও কলেরায় ভুগে মারাও গেলেন অল্প দিন পরেই।

আমাদের রাধানাথ শিকদার ছিলেন এই ডিরোজিয়ান দলের একজন পাণ্ডা। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তি অমর হয়ে আছে :

> **একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে আজ আমাদের সমাজের আলোকপ্রাপ্ত অংশের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের যে-প্রবৃত্তি এবং কদাচারের প্রতি যে-ঘৃণার মনোভাব প্রচলিত হয়েছে, যার ফল ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক না হয়ে যায় না, তার মূলে ছিলেন তিনি [ডিরোজিও]।(১৮৩২)**

গোরা-পেটানোর শখ

প্রাণভরে গোরা-পেটানো ছিল রাধানাথের প্রধান শখ। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো বজ্জাত গোরার সঙ্গে তাঁর ঘুষোঘুষি হত, আর অধিকাংশ দিন তিনিই জিততেন। কারণ তাঁর গায়ে ছিল অসুরের শক্তি। নানা রকমের মাংস খেতে ভালোবাসতেন তিনি, বিশেষ করে গোমাংস। বলতেন, এসব না খেলে কোনো জাতির দেহে শক্তি আসে না। আর দেহে শক্তি না থাকলে মনেও শক্তি থাকবে না।

ডিরোজিয়ানরা তখনকার দিনের সবচেয়ে শিক্ষিত লোক। সে হেন ডিরোজিয়ানদের দলেও তাঁর চেয়ে ভালো অঙ্ক আর ফিজিক্স কেউ জানত না। তখনকার দিনে বিজ্ঞান পড়ার তেমন কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। নিজের আগ্রহে বই খুঁজে নিয়ে মাস্টারমশাইদের কাছে গিয়ে পড়া বুঝে নিতেন রাধানাথ। **একটি ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, তিনি এবং রাজনারায়ণ বসাক, ভারতে এই দুজন প্রথম নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' আয়ত্ত করেন।** অঙ্ক আর ফিজিক্সে তাঁর মাথা দেখে মাস্টারমশাই জন টাইট্‌লার-এর আনন্দ আর ধরে না।

রাধানাথের যখন উনিশ বছর বয়স, তখন তিনি ইংরেজি, গ্রীক, লাটিন ভাষা শিখে ফেলেছেন, ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র শিখেছেন, এমনকি সংস্কৃত শিখেছেন। শুধু শেখা নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইউরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত সব বৈজ্ঞানিক ক্ল্যাসিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করতে হবে। সে কাজ এগিয়েও ছিল কিছুদূর, যদিও শেষ করতে পারেননি। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর গণিত আর ফিজিক্স-এর সাধনা। গণিতের মধ্যেও তাঁর অসাধারণ এলেম ছিল ট্রিগোনোমেট্রিতে, বাংলায় যাকে বলে ত্রিকোণমিতি। এই সাধনায় যখন তিনি মগ্ন, এমন সময়, ১৮৩১ সালে তাঁর জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঢুকল এভারেস্ট সাহেবের প্রবেশ। কে ইনি?

গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একেবারে গোড়ার দিকে এখানে ওখানে মাঝে মাঝেই ছোটোবড়ো যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে জিততে ব্রিটিশদের দম বেরিয়ে যেত। তাই তারা ঠিক করল, সবার আগে ভালো ম্যাপ বানাতে হবে। নইলে দেশ শাসন করবে কী করে? সেই উদ্দেশ্যে তারা ১৮০২ সালে কর্নেল লাম্বটন-এর অধীনে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে (জিটিএস) তৈরি করল। উদ্দেশ্য, দেশ জুড়ে জরিপের কাজ চালানো। লাম্বটন মারা যাবার পর ১৮২৩ সালে এই কাজের দায়িত্ব নিলেন জর্জ এভারেস্ট। ইনি খুব পণ্ডিত লোক : অঙ্ক, বিশেষ করে ট্রিগোনোমেট্রিতে ওস্তাদ।

এভারেস্ট দেখলেন, খুব ভালো ট্রিগোনোমেট্রি জানা লোক না পেলে এ কাজ করা অসম্ভব। বিলেত থেকে অবশ্য লোক নিয়ে আসা যায়, কিন্তু তাতে খরচের লাফে মনসা বিকিয়ে যাবে। তখন সারা ভারত জুড়ে খোঁজ পড়ল, কোথায় ট্রিগোনোমেট্রি জানা লোক পাওয়া যায়। পাওয়া কি সহজ নাকি? কারণ তখনও বিজ্ঞানে পড়ানোর কোনো ব্যবস্থাই হয়নি এ দেশে। হিন্দু কলেজে খোঁজ নিতেই রাধানাথ-ভক্ত প্রাণ জন টাইট্‌লার বললেন, এই উনিশ বছরের ছেলেটি যা অঙ্ক জানে, তা এদেশে তো বটেই, ইউরোপেও খুব কম লোকই জানে। এভারেস্ট বললেন, ছেলেটিকে আমার চাই। রাধানাথের তখনও কলেজের পড়া শেষ হয়নি। তাতে কী? এভারেস্ট প্রায় জোর মেরে তাঁকে তুলে নিলেন।

উনিশ বছর বয়সে, ১৮৩২ সালে রাধানাথ ভারত সরকারের সার্ভে বিভাগে 'কম্পিউটর' (তখনকার দিনে লিখত 'Computor') পদে যোগ দিলেন। মূলত অঙ্ক কষার চাকরি। মাইনে নেহাৎ কম নয় — মাসে পুরো তিরিশ টাকা! (এভারেস্টের হিসেব মতো ঐ কাজটা কোনো বিলিতি 'কম্পিউটর'কে দিয়ে করাতে গেলে মাসে তিরিশ পাউন্ডেরও বেশি মাইনে দিতে হত)। এভারেস্ট তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন একেবারে দেরাদুনে। সেখানেই তখন জরিপের সব থেকে জটিল কাজগুলো চলছে। দু' চারদিনের মধ্যেই বুঝলেন, জন টাইট্‌লার কিছু বাড়িয়ে বলেননি। ছেলেটি বইয়ের যত ফরমুলা আছে, সেসব তো জানেই, উপরন্তু নিজে মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন ফরমুলা বার করে, নতুন কায়দায় জরিপ করে। সে বড়ো জটিল কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর ত্রিকোণমিতি খুব ভালো করে না জানলে সে কাজ করা যায় না। প্রথমে কোনো একটা জায়গা থেকে ভারী লোহার চেন দিয়ে কয়েক মাইল লম্বা একটা সরলরেখা টানতে হয়। তারপর দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের কোনো চেনা তারার অবস্থান দেখে তার সঙ্গে মাটিতে টানা ঐ সরলরেখার এক প্রান্তকে মিলিয়ে একটি অসমাপ্ত ত্রিভুজ আঁকতে হয়। সেই অসমাপ্ত ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য আর কোণ মেপে ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা দিয়ে তিন নম্বর বাহুর দৈর্ঘ্য হিসেব করে বার করতে হয়। তখন গোটা ত্রিভুজটার আয়তন মেপে জরিপের কাজ চলে। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, ও পাহাড় থেকে সে পাহাড়। এ উপত্যকা থেকে সে উপত্যকা। এ ত্রিভুজ থেকে ও ত্রিভুজ। আঁকা হয়ে চলে ম্যাপ।

ভ্যান্সিটার্ট-রাধানাথ দ্বৈরথ

টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আর রাধানাথ দেরাদুনে জরিপ করতে গিয়েও সাহেব পেটান, তবে ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়। জরিপের ভারী ভারী যন্ত্রপাতি (ঘোরানো টেলিস্কোপ বসানো থিওডোলাইট তার মধ্যে প্রধান) এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় পাহাড়ি লোকেদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হত। একদিন শিকদার দেখেন, সেইসব শ্রমিকদের মাথায় বেআইনিভাবে নিজের বাড়ির আসবাবপত্র চাপিয়ে কাজ করাচ্ছে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান্সিটার্ট। যেসব শ্রমিক সে কাজ করতে রাজি হয়নি তাদের বেধড়ক মেরেছে ভ্যান্সিটার্টের লোকেরা। দেখে রাধানাথের মাথায় খুন চড়ে গেল। তিনি শ্রমিকদের সটান সব জিনিস নামিয়ে রাখতে বললেন। তিনি জানেন, মালের টানে সাহেব ঠিক ছুটে আসবে। হলও তাই। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট আর সঙ্গী এসে হুম্বিতম্বি শুরু করে দিল, গালমন্দ করল, বলল এখুনি সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দাও। ডিরোজিওর চেলা রাধানাথ বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট, তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, এই কুলিরাও মানুষ। কেউই আইন ভাঙতে পারে না। তবু জিনিস আমি ফিরিয়ে দিতে রাজি, যদি তুমি লিখিতভাবে কবুল করো যে মালগুলো তোমারই।' সেটা আর সাহেব কী করে নেন! তাহলে তো লিখিত প্রমাণ থেকে যায় যে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তিনি কুলিদের বেগার খাটাচ্ছেন। অগত্যা দেখে নেব-টেকে নেব বলে ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেন।

রাধানাথের নামে মামলা রুজু হল — তিনি নাকি বেআইনিভাবে অন্যের জিনিস জবরদখল করে রেখেছেন! জরিমানা হল। বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, দেখো, ওরা সাহেব, রাজার জাত, ওদের টক্কর দিতে যাওয়া কি আমাদের সাজে? রাধানাথ কর্ণপাত করেননি। তিনি আপিল করলেন। তাতে কি আর ভবি ভোলে? লাভের মধ্যে, দু শো টাকা জরিমানা দিতে হল তাঁকে। তখনকার দিনে দু শো টাকা মানে এখনকার কত হাজার টাকা? শিকদার বললেন, কুছ পরোয়া নেই, জরিমানা দেব, কিন্তু মাথা নোয়াবো না। এর একটা ফল এই হল যে এর পর থেকে আর কোনো সাহেব কর্মকর্তা ঐভাবে কুলিদের দিয়ে বেগার খাটাতে সাহস করত না।

রাধানাথ খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে যে-এভারেস্ট তাঁর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি কিন্তু এই সময় তাঁর পাশে এসে না দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটেরই পক্ষ নিয়েছিলেন। এভারেস্টেরই অফিসঘরে রাধানাথের অনুপস্থিতিতে রাধানাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান্সিটার্ট, যিনি হলেন গিয়ে আসল অপরাধী! এই মামলাটির বিস্তারিত বিবরণ বেরোয় ডিরোজিয়ানদের কাগজ *দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর*-এ, তিন সংখ্যা জুড়ে। রাধানাথ নিজে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন। কাগজটি মন্তব্য করে, আমরা ভেবে পাচ্ছি না, এর পরেও কী করে ভান্সিটার্ট সাহেব সরকারি চাকরিতে বহাল আছেন। ব্রিটিশদের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি বোধহয় ডিরোজিয়ানদের একটু বেশি বিশ্বাস ছিল।

১৫ নং চূড়া : নামে কী আসে যায়!

এর অল্পদিন পরেই ১৮৪২ সালে এভারেস্ট সাহেব অবসর নিয়ে বিলেতে ফিরে গেলেন। তাঁর পদে বসিয়ে গেলেন পরম প্রিয়পাত্র কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়-কে। ওয় রাধানাথকে ১৮৫১ সালে কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, এবার আপনি এখানকার উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর উচ্চতা মাপার ব্যবস্থা করুন। শুরু হয়ে গেল কাজ। সে সময় অজানা পাহাড়-চূড়াগুলোর নাম দেওয়া হত নম্বর দিয়ে। ঐরকম একটা বেশ বড় অজানা পাহাড়ের নাম ছিল '১৫ নং চূড়া'। রাধানাথ পাক্কা ছটি বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া মাপজোক মিলিয়ে অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক কষে দেখলেন, ঐ '১৫ নং চূড়া'-র উচ্চতা ২৯০০২ ফুট। মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর। তা যদি হয়, তার মানে তো ...। কিন্তু না, তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন না তিনি। আলোর রশ্মি বায়ুমণ্ডলে কতটা বেঁকে যেতে পারে কিংবা বরফের ওপর প'ড়ে কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, সেই হিসেবটা করলেন। গবেষকরা বলেন, এই হিসেবটাতেই তাঁর গাণিতিক প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হলেন তিনি : '১৫ নং চূড়া'-ই পৃথিবীর সবথেকে উঁচু শৃঙ্গ। এবার ভালো করে গুছিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখলেন। সমস্ত যুক্তিতথ্য নিখুঁতভাবে সাজালেন। তারপর ১৮৫৪ সালের এক সুপ্রভাতে কর্নেল অ্যান্ড্রু-র অফিসে রিপোর্ট পেশ করে বললেন, স্যার, '১৫ নং চূড়া'-ই যে পৃথিবীর সবথেকে উঁচু চূড়া, তার যাবতীয় প্রমাণ এই রিপোর্টে দেওয়া আছে।

অ্যান্ড্রু হুঁশিয়ার লোক, বইয়ে কিছু বললেন না। তলায় তলায় খোঁজ লাগালেন, বাইরের কোনো দেশের কোনো শৃঙ্গ কি সত্যিই এর চেয়ে উঁচু নয়? বছর দুয়েক ধরে চলল তাঁর অনুসন্ধান। না, কোনো শৃঙ্গই ওর চেয়ে লম্বা নয়। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন, এইবার সেই মোক্ষম সময় এসে গেছে। বিলেতের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে জানালেন, 'তাঁর ডিপার্টমেন্ট' এক মহান আবিষ্কার করেছে। সোসাইটি এই আবিষ্কার করার জন্য খুব খাতির করল অ্যান্ড্রুকে। বলল, এবার তো তাহলে এর একটা ভালো নাম দেওয়া দরকার।

এভারেস্ট সাহেব একটা নিয়ম চালু করে গিয়েছিলেন, যখনই কোনো নতুন পাহাড়চূড়া আবিষ্কার হবে, তার স্থানীয় নামটিই বহাল রাখতে হবে। এই নিয়ম অনুসারেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী, নাঙ্গা পর্বত, মাছের পুচ্ছ প্রভৃতি নাম বহাল রয়েছে। তাহলে '১৫ নং চূড়া'-র ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাই হবে। কিন্তু কী তার স্থানীয় নাম? এইখানে একটা সমস্যা দেখা দিল। '১৫ নং চূড়া'র একদিকে নেপাল, অন্যদিকে তিব্বত। নেপাল আর তিব্বতে তার নানান নাম : কেউ বলে চোমোলাংমা, কেউ বলে চোমোকাংকর, কেউ বলে দেওধুঙ্গা (= ভগবানের পাহাড়)। তাহলে কোন নামটা বেছে নেওয়া হবে? তিব্বতি নাম বেছে নিলে নেপালিরা চটে যাবে, নেপালি নাম দিলে তিব্বতিরা চটে যাবে। ব্রিটিশদের রাজনৈতিক অবস্থা তখন বেশ নড়বড়ে। কাজেই এখন সেধে নেপাল আর তিব্বতের সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে তারা একেবারেই রাজি নয়।

এইসব যুক্তি সাজিয়ে কর্নেল ওয় রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটিতে এক চিঠি লিখলেন। বললেন, একটি মাত্র ঢিল ছুঁড়ে করে ছুঁড়তে পারলে সবকটি পাখি একসঙ্গে মারা পড়বে : কোনো স্থানীয় নাম না দিয়ে ওয়-র গুরু এভারেস্টের নামে '১৫ নং চূড়া'র নাম দেওয়া হোক। গুরুর পদতলে বসেই তো তাঁর যা কিছু শিক্ষা। তাই গুরুদক্ষিণা দেওয়ার এমন মহৎ সুযোগ তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না। রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটি একটু সময় নিল। তারপর ওয়-র প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। সারা পৃথিবীতে মহা সমারোহে ঘোষণা করে দেওয়া হল : পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চূড়াটি আবিষ্কার করেছেন কর্নেল ওয়, আর তার নাম মাউন্ট এভারেস্ট।

আশ্চর্য! এভারেস্ট চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিলেত ফিরে যান ১৮৪৩ সালে, আর পনেরো নং-এর উচ্চতা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় ১৮৫৬ সালে। তবু তার নাম মাউন্ট এভারেস্ট। সত্য সেলুকস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাম মুছে দেওয়ার চক্রান্ত

বাস্তবিক, শিকদারের নাম মুছে দেওয়ার একটা প্রয়াস সার্ভে বিভাগে তলায় তলায় চলছিল অনেক দিন ধরেই। একটি বিশেষ কলঙ্কজনক ঘটনা তো এমনকি বহু ব্রিটিশকেও শিহরিত করেছিল। স্মিথ ও থুইলিয়রের (Smyth & Thuillier) -এর সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে সার্ভেবিভাগ থেকে একটি 'ম্যানুয়াল' বেরোয়। এটি একটি অসামান্য কাজ বলে নন্দিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া হয় যে অমুক অমুক অধ্যায় বাবু শিকদারের লেখা। বিশেষ করে সেইসব অধ্যায় যেখানে ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও স্ফেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রির প্রয়োগ আছে। এ ছাড়াও লেখা হয়, এই বই লেখার কাজে আগাগোড়াই নানাভাবে সাহায্য করেছেন রাধানাথ। বইটি সার্ভে-র কাছে অমূল্য বলে বিবেচিত হয়। ১৮৫৫ সালে বেরোয় এর দ্বিতীয় মুদ্রণ। এর পরই

শুরু হয় খেলা। রাধানাথ মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ১৯৬২ সালে অবসর নেন, ১৮৭০ সালে সাতান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর ১৮৭৫ সালে ঐ ম্যানুয়ালের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। দেখা গেল, পুরো ভূমিকাটি উধাও! কারো নামে কোনো স্বীকৃতি নেই। যেন সম্পাদকরা নিজেরাই সব লেখা লিখেছেন!

এই নোংরা ঘটনাটা এতই অসহনীয় রকমের অন্যায় যে কর্নেল জন ম্যাকডোনাল্ড "cowardly sin" এবং "robbery of the dead" বলে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। সেই অপরাধে মহামান্য বড়োলাট লর্ড লিটন তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাসপেণ্ড করেন। শিকদারের অমূল্য অবদানকে এইভাবে মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

কিন্তু মুছে দেব বললেই কি পুরোপুরি মুছে দেওয়া যায়? গায়ের জোরে '১৫ নং চূড়া'র নাম নম্বর মাউন্ট এভারেস্ট দিলে, বইয়ের ভূমিকা থেকে সমস্ত স্বীকৃতি নামের তুলে দিলে, পরাধীন ভারতীয়দের সেটা হজম না করে উপায় নেই। কিন্তু **জার্মান ফিলজফিক্যাল সোসাইটির বাভেরিয়া শাখার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগ যখন ১৮৬৪ সালে যেচে রাধানাথকে তাদের সম্মানিত বিদেশি সদস্য পদে বরণ করল,** সেটাকে তো আর ঠেকানো যায় না! তারা তো তোমার প্রজা নয়।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, পনেরো নম্বর চূড়া মাপা তাঁর জীবনের অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ মাত্র। ও কাজটা না করলেও তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। যদি বলি, রাধানাথ শিকদারই এ যুগের প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী, খুব অন্যায় বলব কি? গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার কথা ছেড়ে দিলাম, তিনিই ভারতের প্রথম আবহবিদ। আবহ-গবেষণার জন্য, নানা ধরণের পরিমাপের জন্য যেসব ফর্মুলা ও কাজের পদ্ধতি তিনি বার করেছিলেন, তা গোটা উনিশ শতক জুড়ে আবহবিদদের পথ দেখিয়েছে। ১৮৬০-এর দশকে কলকাতা অঞ্চলের ঝড় নিয়ে এক অসামান্য গবেষণা করেছিলেন।

সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো

তবে যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড, তিনি জীবৎকালে এইসব নিয়ে খুব মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগে থেকেই তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, ছাত্রদের অঙ্ক শেখানো, সহজ বাংলায় প্রবন্ধ লেখা এইসব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করতেন। তাতেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়।

আরেকটু বেশি বয়সে বাচ্চাদের দঙ্গল নিয়ে খেলাধুলা আর গালগল্পে মেতে থাকতেন রাধানাথ। ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনদের যত ছানাপোনা, সবাইকে নিয়ে দিন কাটত তাঁর। অল্পবয়সে তাঁর মা আট বছরের একটি খুকির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলে অভিমানে সারা জীবন বিয়েই করেননি তিনি। চন্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়ায় একেবারে গঙ্গার ওপর একটা ভারী সুন্দর বাড়ি কিনেছিলেন। চন্দননগর তখন ফরাসিদের অধীন, সেখানে আর যাই হোক ব্রিটিশদের জারিজুরি খাটত না। তাই বোধহয় শেষ জীবনটা সেখানেই শান্তিতে কাটাতে চেয়েছিলেন। অবশেষে সেইখানেই ১৮৭০ সালের ১৭ মে মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হল তাঁর।

জীবৎকালে বিদেশি শাসকের কাছে প্রাপ্য সম্মান পাননি তিনি। আজ কি আমরা তাঁর স্মৃতিতে কিছু করতে পারি না? আমরা কি বলতে পারি না যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার তিব্বতি নাম চোমোলাংমা, নেপালি নাম দেওধুঙ্গা, ভারতীয় নাম রাধানাথ শৃঙ্গ, আমাদের ঘরের নাম রাধাচূড়া?

[বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করে রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে নতুন চর্চা জাগিয়ে তোলার জন্য লেখক শ্রীমতী অলকা চৌধুরী, শ্রী অঞ্জন সেনশর্মা ও শ্রী আর আর কেলকর-এর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধের তথ্যগুলি অধিকাংশে এঁদের গবেষণা থেকেই সংগৃহীত।]

বইপত্র সংরক্ষণ : কীভাবে

সুধীরকুমার সেন

খেদ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।' আমরা আজও সে কাজ করিনি।

ইতিহাস সংরক্ষার প্রধান এবং প্রথম কাজ ইতিহাসের উপাদান সংরক্ষা। এই উপাদান সংস্কৃতির সব কিছুই। প্রধানত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলেখ্য যার প্রধানতম বইপত্র বা সাধারণভাবে যাদের বলা হয় কাগজ-পত্র — পুঁথি, পুস্তিকা, পত্র, পত্রিকা, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ, ছবি, এমনকি ফোটোগ্রাফ। ব্যক্তিগত স্তরে এই সমস্ত সংরক্ষণ বাঙালির ধাতে নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতই উদাসীন যে এমনিই নষ্ট হতে দি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কী বলে ফেলে দেওয়া!

বাঙালীর প্রধানতম সমস্যা সে দরিদ্র বা নির্ধন। বাসস্থানে যে পরিমাণ স্থান লভ্য হলে বইপত্র বা তথা কথিত জঞ্জালের সঙ্কুলান হতে পারত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা নেই। তাছাড়া, এসব কাজ তো ব্যক্তির হতে পারে না, প্রতিষ্ঠানের কাজ। দেশে তেমন প্রতিষ্ঠানের অভাব। সে ক্ষেত্রে কিছু ফেলে দেওয়া, কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যেতে পারে। এখানেও সমস্যা অনেক। ইতিহাস ব্যাখ্যাকার সি ই কার তাঁর 'হোয়াট ইজ হিস্টরি' বইতে লিখেছেন, সমসাময়িক কালে সংবাদপত্রে সাইকেল চুরির খবর বের হলে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু দেড়শ বা দু'শ বছর আগের (মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) কোন সংবাদপত্র বা নথিপত্রে সাইকেল চুরির খবর লিপিবদ্ধ হলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সে কারণে ফেলা বা রাখার ব্যাপারে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া সমস্যা।

কাগজ : বই, কাগজপত্র সবই কাগজে কালি দিয়ে লেখা বা ছাপা। ভাল কাগজের আয়ু পাঁচশো এমনকি হাজার বছরও হতে পারে। হাতে তৈরি তুলোট কাগজে লেখা বেশ কয়েকশো বছরের পুরনো পুঁথির কথা তো আমরা জানি। 'খারাপ' কাগজের আয়ু পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বছরের বেশি নাও হতে পারে! কাগজের বদলে লেখার জন্য অন্য কোনো মাধ্যম বা বস্তু বিশেষত প্লাস্টিক জাতীয় কোনো মাধ্যম উদ্ভাবনের চেষ্টা এখনও সার্থক হয়নি। কাগজের বা কাপড়ের অন্য কয়েকটি কাজ যেমন ফেস্টুন, ব্যানার বা প্যাকেজিং এইসবের জন্য বিকল্প মাধ্যম এখন পাওয়া যায়। কিন্তু লেখার বা বই ছাপার কাগজের বিকল্প এখনও হয়নি।

কাগজের উপাদান সেলুলোজ একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল কার্বন যৌগ। উদ্ভিদ শরীরের প্রধান অংশই সেলুলোজ। সেলুলোজের ভাগ সবচেয়ে বেশি আছে তুলোয়। এখন কাগজ তৈরি হয় মণ্ড যন্ত্রে — কাঠ, খড়, বাঁশ, বিভিন্ন ধরনের ঘাস (অনেক সময় তার সঙ্গে মেশানো হয় পুরনো কাগজ, কাপড় ইত্যাদি) দিয়ে।

সেলুলোজ আঁশ জাতীয় পদার্থ, সেজন্য কাগজ লম্বা করা যায়, টান টান রাখা যায় এবং ভাঁজও করা যায়। কাগজে সেলুলোজের সঙ্গে থাকে লিগনিন নামক রাসায়নিক পদার্থ। লিগনিন বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে ক্রমশ লালচে হয়ে যায়। পুরনো বই, খাতা হলদেটে বা লালচে হওয়ার রহস্য সেটাই। এজন্য বর্তমানে কাগজে লিগনিনের পরিমাণ যথাসম্ভব কম রাখার চেষ্টা করা হয়। সেলুলোজ, লিগনিন ছাড়াও আরও অনেক রকম রাসায়নিক কাঠ, খড়, বাঁশ ইত্যাদিতে থাকে, তাদেরও যথাসম্ভব তাড়াতে হয় — সাধারণভাবে

ক্যালসিয়াম বাই সালফাইট বা অন্য দু-এক প্রকার রাসায়নিক প্রয়োগ করে এ কাজ করা হয়। উপকরণগুলোর মিশেলে তৈরি মণ্ড বা পাল্প থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তাতে কোনো মসৃণতা থাকে না, ব্লটিং কাগজের মত কালি শুষে বেরিয়ে যায়। সেজন্য চীনমাটি জাতীয় রাসায়নিক, খড়িবিড়ি, কয়েক ধরনের রজন মেশানো হয় — একে বলে সাইজিং। কাগজের গুণমান নির্ভর করে সাইজিংয়ের ওপর।

আমরা জানি জলের pH মান 7 অর্থাৎ প্রশমিত। pH মান সাতের কম হলে আম্লিক এবং সাতের বেশি হলে ক্ষারীয়। প্রথম দিকে কাগজকলে তৈরি কাগজের রাসায়নিক ধর্ম বিশেষ জানা ছিল না। সাইজিংয়ের সময় যে সব রাসায়নিক ব্যবহার করা হত কিংবা উদ্ভিজ্জ উপাদানের মধ্যে থাকা অম্লদ্রব্য তাড়াতে না পারার জন্য কাগজ হত স্বল্পায়ু। তাড়াতাড়ি ফ্যাকাশে হয়ে যেত, সহজে ছিঁড়ে বা ভেঙে যেত, ধুলো ও পোকামাকড়, ছত্রাকের কবলেও পড়ত। ১৯৩০-এর দশকে উইলিয়াম জেমস বারো (১৯০৪-১৯৬৭) নামে একজন রসায়ন বিজ্ঞানী ও নথি সংরক্ষণবাদী বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বই ও কাগজপত্র নিয়ে গবেষণা চালান আমেরিকায়। আবিষ্কার করেন অম্লিক কাগজের বিষয়টি। কাগজ থেকে অ্যাসিড তাড়িয়ে তাতে ক্ষারযুক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। জানা গেছে কাগজ ভাল রাখতে গেলে অন্তত দুই শতাংশ ক্ষারীয় হওয়া দরকার। সাইজিংয়ের সময় নির্দিষ্টভাবে যদি আরও ক্ষারীয় ও অন্যান্য কিছু গুণ আনা হয় তাহলে সেই কাগজ হাজার বছরও টিকবে, পোকা পতঙ্গ, প্রতিকূল বাতাবরণ প্রতিহত করে, এমনটিই মনে করা হচ্ছে। সাধারণ কাগজ বেশি গরমে বা বেশি ঠাণ্ডায় খারাপ হয়ে যায়, দ্রুত আয়ু কমে। খুব বেশি শুকনো আবহাওয়া বা বেশি আর্দ্রতাও কাগজের পক্ষে খারাপ। বেশি আলো যেমন ক্ষতিকর, অন্ধকারও ক্ষতিকর। এ কারণেই বইপত্র বা কাগজপত্র খোলা তাকে স্নিগ্ধ আলোর পরিবেশে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কুড়ি-পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু যে দেশে বড় বড় গ্রন্থাগারেও এ ব্যবস্থা করা যায় না, সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে এরকম ব্যবস্থা ভাবাই যায় না।

বই ভাল রাখা : বই ব্যবহার করলে ভাল থাকে। একদম বন্ধ করা আলমারিতে (কাঠ, কাচ বা স্টিলেরই হোক) বইয়ের আয়ু কমে যায়। খোলা র‍্যাকে বই রাখা ভাল। তবে যেখানেই থাক কিছুদিন অন্তর (ধরা যাক মাসে দুবার বা অন্তত একবার) নাড়াচাড়া করে ধুলো ঝাড়া উচিত। অন্ধকারে বই রাখলে পোকা ধরার সম্ভাবনা বাড়ে। তা বলে সরাসরি সূর্যের আলোতেও বই রাখা ঠিক নয়। সূর্যের অতিবেগুনী এবং অবলোহিত রশ্মি বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য বিক্ষিপ্ত আলো যেখানে আসে বই রাখা উচিত সে রকম জায়গায়। সাধারণ কাচ অতিবেগুনী রশ্মি আটকে দেয়, কিন্তু স্বাভাবিক আলো যেতে দেয়। ঘরে কাচের জানালা থাকলে বা আলমারির দরজা কাচের হলেই ভাল। কোনো কারণে বই ভিজে গেলে অনেকেই চড়া রোদে শুকিয়ে নেন। এটা একেবারেই উচিত নয়। এ রকম করলে বইয়ের পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার এবং ভিজে পাতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে লেপ্টে আলাদা না হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এক্ষেত্রে প্রথমত তাড়াতাড়ি কোনো শুকনো, পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে যতটা পারা যায় মুছে নিতে হবে। কাপড়ের বদলে টিস্যু পেপার বা ব্লটিং কাগজ হলে আরও ভাল। খোলা জায়গায় রোদে ও হাওয়ায় দশ-পনেরো মিনিট রাখা যেতে পারে। তবে বসন্ত বা গরম কালের চড়া রোদে নয়। পাখার নীচে অল্প হাওয়ায় শুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাগজে যাতে বলিরেখা বা ভাঁজ না পড়ে সেজন্য সন্তর্পণে শুকনো পরিষ্কার সাদা কাগজ তা বইয়ের ভিজে পাতার মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। ভেজা বইকে উদ্ধার করা সময়সাপেক্ষ, যত্নশীল কাজ।

বলা হয়, বই ভাল রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় বইকে আদর করা। অর্থাৎ বইয়ের গায়ে, বইয়ের পাতায় হাত বুলানো। এতে ধুলো ময়লা যায়। আলো হাওয়া লাগে। আমাদের সারা শরীরে ঘর্ম গ্রন্থি এবং সেবাসিয়াস গ্রন্থি (বাংলায় বলা হয় 'রোম' গ্রন্থি। এই গ্রন্থি হাতের তালু ও পায়ের পাতার তলায় নেই)। এই দু ধরনের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়ন ট্রেস কম্পাউন্ডস আর ট্রেস এলিমেন্টস — নামমাত্র অ্যালকোহল কিংবা ভারী ধাতুর কয়েকটি জটিল লবণ। এ ছাড়াও বের হয় কিছু ল্যাকটেট, লিপিড, এস্টার ও ফ্যাটি অ্যাসিড। সম্ভবত এই এস্টার ও ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্যই কাগজে একটু মসৃণ চকচকে ভাব হয়, বাতাসের জলীয় বাষ্প থেকে ক্ষতি কম হয়, ছাতা বা ছত্রাক ধরার সম্ভাবনা কমে, অন্য ব্যাকটিরিয়া বা পরজীবীদেরও বাধা দিতে পারে। ট্রেস এলিমেন্ট ও আয়নগুলিও বীজাণু বা ছত্রাক ঠেকাতে সাহায্য করতে পারে; ল্যাকটেট লবণগুলি আবার ব্যাকটিরিয়াদের সাহায্য করতে পারে, তবে ছত্রাকদের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সবক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়। হাতের তালুতে 'রোমগ্রন্থি' না থাকলেও আমাদের অভ্যাস মধ্যে মধ্যেই মাথায় বা হাতের উল্টোদিকে হাতের তালু ঘষে নেওয়া। তার ফলে তালুর ঘামের সঙ্গে রোমগ্রন্থির ক্ষরণ মিলে মিশে যায়। এতেই কাজ হয়। এজন্য হাতের উল্টো দিক দিয়েও 'আদর' করা উচিত। কিন্তু পাতার উপর হাত বুলিয়ে দিলে সবচেয়ে বড় উপকার পোকামাকড়ের ডিম বা ধুলো ময়লার বিরুদ্ধে প্রাথমিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। খেয়াল রাখতে হবে — হাত যেন ভেজা বা অপরিষ্কার না থাকে। লিপিড যৌগগুলিও কাগজের পাতার পক্ষে উপকারী।

পোকামাকড় এবং নেংটি ইঁদুরের মত ছোট প্রাণী বইয়ের কাগজপত্রের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। আরশোলা বা তেলাপোকা সাধারণত বাঁধাই জায়গা বা মলাটের কোনো অংশ কুরেকুরে তুলে দেয়, আরশোলা নিবারণ করার অনেক ওষুধ বা ব্যবস্থা আছে। বইয়ের সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা কয়েক ধরনের ক্ষুদে গুবরে পোকা (beetle)। এরা বইয়ের ওপর ডিম পাড়ে, তা থেকে শূককীট বের হয় (খুবই ছোট খালি চোখে অনেক ক্ষেত্রে দেখাই যায় না, এবং এরা সাধারণত নিরিবিলি অন্ধকার পছন্দ করে)। সেই শূককীট বইয়ের পাতার সেলুলোজ খেতে খেতে কোনো একটা দিক দিয়ে বের হয়ে তারপর দু একদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উড়ে চলে যায়। বইয়ের ভেতর সুড়ঙ্গের মত অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি এভাবেই হয়।

বাড়িতে উই থাকলে তা বইয়েও লেগে যেতে পারে। উই ঠেকাবার উপায় খরচ সাপেক্ষ। বইয়ের র‍্যাক বা আলমারি দেওয়াল থেকে কিছুটা ফাঁক ছেড়ে রাখা এবং পারলে পায়াগুলি জলের বাটিতে রাখা। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি প্রায় অসম্ভব। অন্য উপায় — নিয়মিত মেঝে পরিষ্কার করা; নুন আর কর্পূর দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এতে পিঁপড়ের উপদ্রবও কমবে। নিয়মিত ঝাড়াঝাড়ি না করলে মাকড়সার বাসা হতে পারে। মাকড়সার রসে এক ধরনের আঠালো পদার্থ থাকে — তার ফলে বইয়ের ওপর ধুলো জড়িয়ে, পাতা জুড়ে যায়। অনেক সময় বইয়ের আলমারি বা বইয়ের ওপরেই কুমোরে পোকা বাসা বানিয়ে ফেলে। বাংলায় যাকে গ্রন্থকীট বা বইপোকা বলে (ইংরিজি নাম silver fish) এরা বই বা কাগজের স্টার্চ আশ খায়। বইয়ের অক্ষর খেয়ে জেড় আলগা করে দেয়।

সাধারণত বাচ্চা হবার সময় মা ইঁদুরটি এসে বইয়ের বা কাগজপত্রের মধ্যে আশ্রয় নেয়। কাগজ কুচিয়ে জায়গাটা বিছানার মতো করে ফেলে।

বাচ্চা ইঁদুর দাঁত গজানোর সময় যে কাগজ পায় তাই কুটি কুটি করে। একটু সতর্ক থাকলে ইঁদুরের উপদ্রব এড়ানো যায়।

বইকে বাঁচাতে যদি পারা যায় কোনো পেশাদার ব্যক্তিকে দিয়ে বছরে দু তিন বার ওষুধ দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা গেলে ভাল।

নিম : অনেকেই বইয়ের মধ্যে নিম পাতা দিয়ে রাখেন বা ছোট ডাল পাতাশুদ্ধ বইয়ের র‍্যাকে তুলিতে রেখে দেন। নিমপাতা ছত্রাক, জীবাণু ও পোকামাকড় প্রতিহত করতে পারে। তবে কাঁচা নিমপাতা বইয়ের মধ্যে রাখলে পাতায় দাগ হয়ে যেতে পারে। নিমের ফলের খোসা ও বীজ, শিকড়, ছাল, ফুল ইত্যাদিতেও নানা জীবগত সক্রিয়ক যৌগিক আছে। নিমের পাতার চেয়েও বীজ থেকে তৈরি তেলের পোকামাকড়, ছত্রাক এমন কি ছোট প্রাণী যেমন ইঁদুর তাড়াবার গুণ আছে।[৫] নিম তেল থেকে তৈরি 'স্প্রে' বইয়ের র‍্যাকে দিলে পোকামাকড়, ইঁদুর ইত্যাদির উপদ্রব কমতে পারে। নিমপাতা প্রয়োগ করার সবচেয়ে ভাল উপায় পাতলা কোন কাপড়ের (সুতির পুরনো ধুতি, শাড়ি বা গামছার) টুকরোয় নিমপাতা ভরে পুটলি করে বইয়ের র‍্যাকে রেখে দেওয়া। এতে পাতার গুঁড়ো ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া, র‍্যাকে 'মথ বল' বা 'ন্যাপথলিন' দিয়ে রাখলেও অনেকটা কাজ হয়।

অন্য নথিপত্র : কাগজপত্র বা নথিপত্রের ক্ষেত্রেও ঐ একই রকম ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পুরনো নথি থাকলে সবচেয়ে ভাল উপায় 'ল্যামিনেশন' করে রাখা। এই ধরনের পুরোনো নথিপত্রের জন্য দিল্লিতে অবস্থিত 'জাতীয় মহাফেজখানা' বা 'ন্যাশনাল আর্কাইভের' সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ওরা সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করে — সাধারণত 'ল্যামিনেট' করে দিয়ে। এক প্রস্থ কপি (সাধারণত মাইক্রোফিল্ম কপি) নিজেদের হেফাজতে রেখে মূল নথি মালিককে ফেরত দিয়ে দেয়। কেবল ব্যক্তিগত সংগ্রহের কাগজপত্রই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহের কাগজপত্রও সংরক্ষায় সাহায্য করে।

পোকা লাগা বই : বইপত্রে পোকা লেগে গেলে, খারাপ হয়ে গেলে তাদের মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। তার একটি উপায় অবশ্যই বাঁধানো। অনেক সময় শক্ত বোর্ড বাঁধাই না করে নরম মোটা কাগজের বাঁধাই বেশি টেকসই হতে পারে। যে কোনো বাঁধাইয়ের ব্যাপারে দুটি বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকা দরকার। যে আঠা ব্যবহার হচ্ছে তা যেন পোকামাকড়ের খাদ্য না হয় বা পোকামাকড় আকর্ষণ না করে। বই বাঁধাইয়ের সময় প্রয়োজনে বইয়ের ধার বা কানা কেটে ফেলা হয় এবং এই কাটার পরিমাণ অন্তত তিন-চার মি. মি. হয়ে যায়। ফলে দুবার এরকম কাটা হলে লেখা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্য দফতরিকে বাঁধানোর সময় যার বরাবর কাটতে বারণ করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বইয়ের কাগজ এতটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং পোকায় এত বেশি ফুটো ফুটো করে দিতে পারে যে বাঁধাই করে এমনকি ল্যামিনেট করেও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বইটা খুলে ফেলে জেরক্স করে জেরক্স কপিটা বাঁধাই করাই বোধহয় সর্বোত্তম পন্থা।

পোকা লাগা বইতে প্রায় অদৃশ্য পোকার ডিম ইত্যাদি থেকে যেতে পারে বলে বইয়ের শুদ্ধীকরণ দরকার হয়। একটি কাঠের বা কাঠের বাক্সের নীচের দিকে কয়েক সে.মি. বাদ দিয়ে একটি তারের শক্ত জাল লাগানো থাকে, জালের ওপর উল্টো করে খুলে বই রাখা হয়। জালের নীচে একটি কাচ পাত্রে 'থাইমল' রাখা হয়। এই ধরণের বাক্সকে বলে থাইমল চেম্বার। থাইমল সামান্য উদ্বায়ী পদার্থ। তরল অবস্থায় পাওয়া যায় থাইমল অয়েল নামে। বিশুদ্ধ কেলাস পাওয়া যায়। তরল বা কেলাস যে কোনটা ব্যবহার করা যায়। থাইমলের বাষ্প বা ধোঁয়া ছত্রাকের অঙ্কুর (spore) খুব সহজে নষ্ট করে। তা ছাড়া নানা ধরনের ক্ষুদ্র পোকামাকড় যেমন বিভিন্ন রকম কৃমি কীট, গাছ উকুন, গায়ের পোকা মারার ক্ষেত্রেও কিছুটা কার্যকর হয়। উইপোকা এবং ঘুণ পোকার বিরুদ্ধেও থাইমল কাজ করে।[৬]

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার-এর সংরক্ষা বিভাগ অনেক সময় সাধারণ মানুষকেও তাঁদের ব্যক্তিগত পুস্তক সংরক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন। এভাবে থাইমলের বদলে অন্যান্য রাসায়নিকের ধোঁয়া বা বাষ্প ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিদেশের গ্রন্থাগারগুলিতে পুরোনো বই বাঁধাবার আগে 'থাইমল ট্রিটমেন্ট' করে নেওয়ার রেওয়াজ আছে। বাড়ির বইয়ের ক্ষেত্রে থাইমলের দানা বইয়ের ভেতর, বিশেষ করে বাঁধাইয়ের ফাঁকে দিয়ে বইটি কিছুদিন রেখে দিলে উপকার পাওয়া যাবে। ফাইল বা অন্য কাগজপত্রের মধ্যেও এভাবে দানা রেখে দেওয়া যেতে পারে। থাইমল ছাড়াও অন্য অনেক রকম ফিউমিগেশনের ব্যবস্থা করা যায় — বইপত্র শুদ্ধ করতে।

ডিজিটাল সংরক্ষা : বর্তমানে স্থান সঙ্কুলান ও সংরক্ষা উভয় প্রয়োজনে কম্পিউটারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথিপত্র পুস্তকের কপি রাখা সম্ভব। পদ্ধতিটি হল প্রতিটি পৃষ্ঠা স্ক্যান করে বা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলে প্রথমত হার্ড ডিস্কে জমা রাখা। তারপর তা থেকে সিডি বা কম্প্যাক্ট ডিস্কে ভরে নেওয়া। ডিজিটাল সংরক্ষার অভ্যুদয়ের আগে বইপত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হত। কিন্তু তার খরচা অনেক। কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা আছে। মাইক্রোফিল্ম পড়তে মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা লাগে; তাছাড়া, মাইক্রোফিল্ম থেকে বড় করে 'প্রিন্ট' নেওয়া যায়। মাইক্রোফিল্মের আয়ু বর্তমানের হিসেব মতো, দেড়শ-দুশ বছর বা তার বেশিও হতে পারে, যদি যত্ন করে সংরক্ষা করা যায়। কাগজ যেমন ব্যবহার হচ্ছে বেশ কয়েকশো বছর ধরে, মাইক্রোফিল্ম ব্যবহার হচ্ছে প্রায় সোয়াশ' বছর ধরে। কিন্তু মাইক্রোফিল্ম রাখার কিছু ঝামেলা আছে। ফিল্মের রোল কৌটোয় ভরে রাখতে হয়, ঠাণ্ডা জায়গা হলে ভাল হয়। মাইক্রোফিল্ম ছাড়াও 'মাইক্রো ফিশ' বা 'মাইক্রো কার্ডে'ও বিষয়বস্তু (বা এখনকার ভাষায় ডেটা) রাখা যায়। মাইক্রো কার্ড সংরক্ষা সহজতর।[৭]

ডিজিটাল সংরক্ষা এখনও যথেষ্ট বিতর্কিত। একটু ভাল অনাম্লিক (non-acidic) কাগজ পাঁচশ বছর, মাইক্রো ফিশ বা ফিল্ম দু-আড়াইশ বছর থাকবে, কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যম যা সুলভ ও 'অতি সস্তা' সেই 'সিডি'র আয়ু কত কেউ সঠিক জানে না। নানারকম হিসেব বলছে বছর কুড়ি থেকে শতাধিক বছর। সিডি এসেছেই বছর পনেরো কুড়ি; তার মধ্যে এর ভোল পাল্টেছে নানারকম। যে পদার্থ দিয়ে এই মাধ্যমটি তৈরি সেটি মোটামুটি টেকসই, কিন্তু সংরক্ষিত ডেটা কতদিন যথাযথ ভাবে অক্ষত ও পুনঃ পুনঃ ব্যবহারযোগ্য থাকবে সেটাও কেউ ঠিকমত বলতে পারে না। অর্থাৎ আরও বেশ কয়েক দশক না গেলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। এ ছাড়া, আরও দু-তিনটি ফ্যাচাং বা সমস্যা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিদ্যা অতিদ্রুত সব পাল্টে চলেছে। বছর কুড়ি পঁচিশ আগেকার বড় ফ্লপি, বছর দশ-পনেরো আগে আসা ছোট শক্ত ফ্লপি এখন বাতিল, বহু কম্পিউটারে এখন ফ্লপি ড্রাইভ (FDD) থাকছেই না। হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার নিত্য পাল্টাচ্ছে। পুরোনো 'জিনিস' নতুন যন্ত্রপাতিতে আর খাপ খাচ্ছে না। আজকে সিডিতে কোনো ডেটা রেখে দিলে চূড়ান্ত কোনো গ্যারান্টি নেই যে-তা ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পরে পড়া যাবে; এজন্য কয়েক বছর

বছরে বছরে নতুন সরঞ্জাম বাজারে এলে ডেটা বা উপাত্ত পুনর্বীক্ষণ বা বলা ভাল পুনঃ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। সিডিতে কোনো ছত্রাক বা ফাংগাস জাতীয় কোন অণুজীব বাসা বাঁধতে পারে কি না, পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা কতটা কি প্রভাব ফেলতে পারে ঠিকঠাক জানা নেই। ঠাণ্ডা, গরম, তেল, কালি, জল, ধুলো, ধোঁয়া খুব অল্প পরিমাণেও ক্ষতিকর হতে পারে। ডেটা ডিজিটাইজ করে নিশ্চিন্তে বছরের পর বছর রেখে দেওয়া যাবে না।

এর পরেও সমস্যা বাংলা নথিপত্র নিয়ে। বাংলা হরফ বা অক্ষরের জন্য কোন অনন্য 'কোড' (universal code) নেই। ফলত, একটি বাংলা 'কী বোর্ড' বা সফটঅয়্যার দিয়ে টাইপ করা রচনা অন্য কোনো বাংলা সফটঅয়্যারে খোলা বা পড়া যায় না। এ কারণে বাংলা হরফে লেখা রচনা 'ছবি' করে 'পিডিএফ' ফাইল হিসেবে রাখতে হয়। এতে জায়গা (disc space) লাগে অনেক বেশী। বাংলা সফটঅয়্যারের অবস্থাটা এতটাই খারাপ যে একই সফটঅয়্যারের পুরোনো রকমটি (version) নতুনে খোলে না। ভবিষ্যতে হয়তো এইসব সমস্যার সমাধান হবে। এ কারণে কাগজের মূল নথি একেবারে বাতিল করা বা ফেলে দেওয়া ঠিক নয়।

কাগজে লেখা বা মাইক্রোফিল্মে 'ডেটা' থাকে প্রতিরূপে (analog image)। ডিজিটাল ডেটা থাকে সম্পূর্ণ অন্য সংকেতে। কাগজের লেখা বা মাইক্রোফিল্মের লেখা লেন্স দিয়ে বড় করে খালি চোখে দেখা সম্ভব, কিন্তু ডিজিটাল ডেটা পড়বার জন্য উপযুক্ত হার্ডঅয়্যার ও সফটঅয়্যার লাগবেই। একটা মধ্যপন্থা ভাবা যায়, যদিও তা খরচ সাপেক্ষ। কম্পিউটারে ভরে নিয়ে পাতার সাইজ যথাসম্ভব ছোট করে 'প্রিন্ট' নিয়ে নেওয়া। তারপর বাঁধিয়ে রেখে দেওয়া। শক্তিশালী লেন্সে সেই লেখা পড়া যাবে। জেরক্সে মাপ ছোট করা যায়। ভাল জেরক্স মেশিনে দুতিন ধাপে ছোট করে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা যায় — সেক্ষেত্রেও লেন্স দিয়ে পড়া যাবে।

তথ্যসূত্র :

1. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। বিবিধ প্রবন্ধ (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড)।
2. দ্র. ক্ষণন উইকিপিডিয়া (Wikipedia)।
3. Mc Graw Hill Encyclopedia of Science Technology বা Encyclopedia Britanica-র 'paper' সংক্রান্ত ভুক্তি দেখা যেতে পারে।
4. Wikipedia-য় William James Barrow ও Acid Free Paper সংক্রান্ত ভুক্তি ২।
5. ভূস্বর্গ আকারবাবু আমাকে এ ব্যাপারে তথ্য ও জ্ঞান যুগিয়েছেন — ডাঃ ভাস্কর উকিল এবং বিশেষত ডাঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী। ডাঃ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন — সেবাসিয়াস নিঃসরণে মোটামুটি চারটি প্রধান অংশ থাকে — 25% মোমজাতীয় মোনো-এস্টার, 41% ট্রাইগ্লিসারাইড, 16% 'মুক্ত' বা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, 12% স্কোয়ালিন। দেখা যেতে পারে Wikipedia-তে সেবাসিয়াস গ্রন্থির ভুক্তি। এছাড়া অঙ্গুল ছাপ বা আঙুলের ছাপ নিয়ে H. C. Lee, Gaessen লিখিত Advanced in Fingerprint Technology
6. (a) Kausik Biswas et al. Biological activities and medical properties of neem (Azadirachta indica. Current Science 82 (11) 10 June, 2002। (b) T. R. Govinachari. Chemical and biological investi- gations on Azadirachta indica (the neem tree). Current Science 63 (3) 10 August 1992। এই লেখা দুটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন BESU (শিবপুর)-এর গ্রন্থাগারিক ড. হরিপ্রসাদ শর্মা।
7. বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং Google Wikipedia-য় Thymol সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুক্তি।

সানস্ক্রিন ক্রিম : রোদ-ঠেকানো, না লোক-ঠকানো দাওয়াই!

জয়ন্ত দাস

একটি ছেলে, মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে চুরি করে। কোনো মেয়ের মন নয়, তার ফর্সা হবার ক্রিম। তারপর মেয়েদের হৈ ধর ধর ওই চোর। ছেলেটা ধরা পড়ে না। সে যাত্রা বেঁচে যায়। আর জেনে যায়, 'মেয়েলি' ফর্সা হবার মলমের দরকার নেই, কেন না এসে গেছে 'পুরুষদের' ফর্সা হবার মলম। বিজ্ঞাপনটা টিভিতে প্রায় সবার দেখা। পাঠক বুঝতেই পারছেন গল্পটার পরতে পরতে অর্থ। মেয়েদের ফর্সা হওয়া দরকার, কেন না ফর্সা মানে সুন্দরী, আর সুন্দরী না হলে জীবনে রইলটা কি? আগে ছেলেদের সম্বন্ধে বলা হত, সোনার আংটি আবার বাঁকা! এখন ওই ধারণা অচল। ছেলেদেরও ফর্সা হওয়ার দরকার হচ্ছে। যেমনটি জামা-পরা অমিতাভ বচ্চনের উত্তরাধিকার পেতে সিক্স-প্যাক অ্যাবস নিয়ে উঠে আসছেন নয়া ডন শাহরুখ খান, আমির খানরা।

এইসব গল্পের মধ্যে গল্প তার মধ্যে গল্পের আরোপণাস ভেদ করে আমরা একটা গল্প বেছে নিই। গল্পটা সেই মলম নিয়ে, ফর্সা হবার মলম। সুন্দর হওয়ার অনুষঙ্গ কী আছে এই মলমে? চোখ বন্ধ করে একে বিশ্বাস করা যায়? কালোটিস কি সত্যিই গোরাটাদ হয়ে উঠতে পারে? সত্যি হল — ফর্সা হবার মলমে অনেক কিছু থাকতে পারে। এমন অনেক কিছু, যা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। বেশিরভাগ ফর্সা হবার মলমে একটি উপাদান হিসেবে থাকে সানস্ক্রিন। সূর্যের রোদে বা আলোতে আমাদের রঙ কালো হয়ে যায়। এই কালো হওয়াটা যে শরীরকে রক্ষা করার জন্যই এটা রূপচর্চায় মাতোয়ারা ছেলেমেয়েদের কে বোঝায়! সানস্ক্রিন তথা সূর্যপর্দা মলম মাখলে তার আবরণ ভেদ করে সূর্যরশ্মি চামড়ায় ততটা পৌঁছয় না, ফলে রং অতটা কালো হয় না।

বাজারে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া প্রসাধনদ্রব্য হিসেবে সানস্ক্রিন মলম বা লোশন পাওয়া যায় প্রধানত দুটো গোত্রের প্রসাধনীতে। এক সরাসরি সানস্ক্রিন হিসেবে, আর দ্বিতীয়ত ফর্সা হবার মলমের অন্যতম উপাদান হিসেবে। ফর্সা হবার মলমের অন্যান্য সম্ভাব্য উপাদান নিয়ে আলোচনাটা আপাতত মুলতুবি রেখে বাজারি এই সানস্ক্রিন কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আমরা একটু ভেবে দেখব। তার সঙ্গে আমরা দেখব ওষুধ কোম্পানির তৈরি বিভিন্ন সানস্ক্রিন, যেগুলো আমরা কিনি ডাক্তারের পরামর্শে।

সূর্য ও ত্বক :

সূর্য না হলে আমাদের চলে না। সূর্য আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। তা বলে সূর্যের সবকিছুই যে উপকারী তা কিন্তু নয়। সূর্যের কিরণের একটা অংশ হল অতিবেগুনি রশ্মি। অতিবেগুনি রশ্মির তিনটে ভাগ, এ, বি আর সি। বায়ুস্তরের বাধা পেরিয়ে 'সি' রশ্মি সমভূমিতে বিশেষ পৌঁছয় না, যদিও উঁচু পাহাড়ের

চুড়োয় তার কিছুটা পৌঁছয়। আমরা যেভাবে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষইয়ে দিচ্ছি তাতে ভবিষ্যতে 'সি' রশ্মিকে নিয়েও আমাদের আরও ভাবতে হবে।

অতিবেগুনি 'এ' রশ্মি ওজোন স্তরে বিশেষ আটকায় না, এবং সাধারণভাবে মানুষের কাছে যতটা অতিবেগুনি রশ্মি এসে পৌঁছয় তার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগই হল 'এ' রশ্মি। এটা আমাদের ত্বককে কালো করে দেয়, আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে দেয়, এবং আস্তে আস্তে এটা চামড়াকে বুড়িয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হল, কালো হয়ে যাওয়াটা কিন্তু চামড়ার একটা প্রতিরক্ষামূলক অভিযোজন। কালো চামড়া ভেদ করে অতিবেগুনি রশ্মি বেশি গভীরে পৌঁছতে পারে না, ফলে অন্য ক্ষয়ক্ষতি, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানো, ত্বকবার্ধক্য আনা, রোদে পোড়া (সানবার্ন) বা রোদজনিত চর্ম ক্যানসার এগুলো কালো চামড়ায় কম ঘটে। আবার অতিবেগুনি রশ্মির 'বি' অংশটা মধ্যভূমিতে পৌঁছয় অল্প পরিমাণে, মোট অতিবেগুনি রশ্মির শতকরা ৫-১০ ভাগ মাত্র হল 'বি'। কিন্তু এটা বেশ ক্ষতিকর, রোদে পোড়া চামড়ার অকালবার্ধক্য, এমন কি চামড়ার বিভিন্ন ক্যানসার সৃষ্টিতে অল্প পরিমাণ 'বি' অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ 'এ' রশ্মির চাইতেও বড় ভূমিকা নেয়।

আমাদের চামড়ার মধ্যে রয়েছে কালো রং উৎপাদনকারী কোষ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে কোষগুলির সক্রিয়তা বিভিন্ন রকম। আফ্রিকার মানুষের দেহে এই কোষ বেশি কালো রং বা মেলানিন রঞ্জক উৎপাদন করে, আর উত্তর ইউরোপের ধবধবে সাদা চামড়ার মানুষদের দেহে তারা মেলানিন উৎপাদন করে কম। তাই ধবধবে সাদা চামড়ার মানুষ যদি গরমের দেশে গিয়ে বাস করে তবে তার গায়ে সূর্যের রোদ লেগে রোদে পোড়া হতে পারে, এবং বহুদিন ধরে সূর্যের আলোয় থাকলে চামড়ার অকালবার্ধক্য, এমন কি ত্বক ক্যানসারও হতে পারে। এজন্যই অস্ট্রেলিয়াতে (ইউরোপ থেকে আগত মানুষদের মধ্যে) ত্বক ক্যানসার খুব বেশি। আফ্রিকার কালো মানুষদের বা আমাদের বাদামি মানুষদের মধ্যে এধরনের সূর্যালোক জনিত ত্বক ক্যানসার তুলনায় কম।

কতকগুলো রোগ আছে যেগুলো সূর্যের আলো লাগলে বেড়ে যায় — যেমন এস এল ই, রোজাসিয়া, বহুরূপী আলোকস্ফোট এবং মেচেতা। এগুলো সাদা চামড়া বা কালো/বাদামি চামড়ার লোকদের সবার মধ্যেই হতে পারে। তাই এইসব রোগ থাকলে বা সাদা চামড়ার মানুষকে জোরালো সূর্যালোকের দেশে বাস করতে হলে বা বেড়াতে এলে তাদের দেহের উন্মুক্ত অংশে সানস্ক্রিন লাগানোই উচিত।

সবচেয়ে ভালো সানস্ক্রিন

সবচেয়ে ভালো 'সানস্ক্রিন' হল দিনের বেলা বাড়ির দরজা জানলা ঘুলঘুলি সব বন্ধ করে সারাগায়ে কাপড় চাপা দিয়ে বসে থাকা। সেটা তো সম্ভব হয় না, তাই বেরোতে হলে শরীরের যতটা সম্ভব অংশ ঘন বুনোটের কালো বা রঙিন ঢোলা জামা কাপড়ে ঢেকে রাখা, আর বাকি অংশে, যেমন মুখ, কোনও যথাযথ এস পি এফ (সান প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর) যুক্ত সানস্ক্রিন মলম / লোশন বেশ পুরু করে বারবার মাখা হল এর পরের 'ভালো' উপায়। এস পি এফ ব্যাপারটা কি সেটা একটু পরে বলছি।

বাজারি সানস্ক্রিনগুলোর সমস্যা হল, তাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে তা মোড়কের গায়ে লেখা থাকে না, তাই তারা কার্যকারিতার যে দাবি করে তা 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' গোছের। আপনার যদি ব্র্যান্ডনামকেতে কি ব্র্যান্ড শেডনাম শুনলে বিশ্বাস থাকে তো আপনি চোখ বুজে (কেন না চোখ খুলেও আপনি বিশেষ কিছু জানতে পারবেন না) বিশ্বাস করে নেবেন তাদের সানস্ক্রিনটি নিরাপদ, কার্যকর এবং ফ্যাশনদুরস্ত। এই ফ্যাশন ব্যাপারটা নিয়ে যুক্তি-তর্কো চলে না, কিন্তু সেটার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা — এ দুটো ব্যাপার খানিকটা মাপা যায়।

সানস্ক্রিনের কার্যকারিতা মাপার 'একক' এস পি এফ। পুরো নাম সূর্যসুরক্ষা মানক বা সান প্রোটেকটিভ ফ্যাক্টর। কোন সানস্ক্রিন মলমের এস পি এফ যদি ১০ হয় তাহলে ঐ মলমটি শরীরের উন্মুক্ত জায়গায় যথাযথভাবে মেখে রোদে দাঁড়ালে সেখানে অতিবেগুনি রশ্মি দিয়ে চামড়া লাল করতে যতটা অতিবেগুনি রশ্মি লাগবে, সানস্ক্রিনটি না মাখলে তার ১০ ভাগের এক ভাগ রশ্মিতেই ঐ চামড়া লাল হয়ে যাবে। একটু মোটা দাগে বললে, সানস্ক্রিনটি ঠিকভাবে মেখে আপনি দশ ঘণ্টা রোদে দাঁড়ালে যতটা ক্ষতি হবে, না মাখলে সেই ক্ষতিটাই হবে মাত্র এক ঘণ্টায়।

এস পি এফের সুবিধা হল যে এটা একটা সংখ্যা। এটা দিয়ে দুটো সানস্ক্রিনের সরাসরি তুলনা করা সোজা। কোনও সানস্ক্রিনের এস পি এফ যদি ২০ হয় তবে তা এস পি এফ ১০ সানস্ক্রিনের তুলনায় দ্বিগুণ কার্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু সবসময়ে ব্যাপারটা কি এত সোজা? না, তা নয়। কেন না এস পি এফ হিসেব করার সময় ধরে নেওয়া হয় সানস্ক্রিন মলম বা লোশনটা পুরো সময় জুড়ে চামড়ার ওপর সব জায়গায় সমান ও বেশ পুরু একটা আস্তরণ তৈরি করে থাকছে। কিন্তু বাস্তবত তা ঘটে না। ঘামে, জলে ও মুখ (বা হাত) মোছার ফলে এই আস্তরণ কমবেশি কমে যায়। বিভিন্ন সানস্ক্রিনের ক্ষেত্রে ঘাম, জল বা মোছার ফলে চামড়ার ওপরকার আস্তরণটি একইভাবে উঠে যায় না। যে সব সানস্ক্রিন চট করে ঘামে, জলে বা ঘষাতে উঠে যায় না তারা একই এস পি এফ যুক্ত। কিন্তু চট করে উঠে যায়, এমন সানস্ক্রিনের চাইতে বেশি কার্যকর, হয়ত বা বেশি এস পি এফ যুক্ত সানস্ক্রিনের চাইতেও বেশি কার্যকর।

আর আমাদের দেশে আমাদের বাদামি চামড়ায় সাধারণভাবে ১০-১৫ এস পি এফ যথেষ্ট, যদিও সারা দিন রোদে কাজ করলে বা অতিরিক্ত ঘর্মা হলে, বেশি দরকার হতে পারে।

এর ওপরে রয়েছে সানস্ক্রিন মলম বা লোশনের প্রসাধনিক গ্রহণযোগ্যতা। যদি কালো চামড়ার ওপর কোনো সানস্ক্রিন সাদা বা গোলাপি স্তর তৈরি করে, বা মুখটাকে চপচপে তৈলাক্ত করে তোলে তাহলে তা ব্যবহার করা মুস্কিল। কোনো সানস্ক্রিন মাখলে ব্রণ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, আবার কোনোটা মাখলে বেশি ঘাম হয়, বা অতিরিক্ত গরম লাগে। সব মিলিয়ে, ঠিকঠাক সানস্ক্রিন বাছাটা কোনো সহজ এক লাইনের সূত্রে ফেলা যায় না, আর সেটা বিশেষ ব্যক্তির ত্বকের ধরন এবং কী প্রয়োজনে সানস্ক্রিন মাখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রেই দু-তিনবার ব্র্যান্ডবদল করে হয়ত সঠিক সানস্ক্রিনটি খুঁজে পাওয়া যায়। ডাক্তারি সানস্ক্রিনগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা মেটের ওপর প্রসাধন হিসেবে যে সব সানস্ক্রিন বিক্রি হয় তাদের চাইতে কিঞ্চিৎ বেশি হলেও আমাদের দেশে অন্তত ডাক্তারি সানস্ক্রিনগুলোর প্রতিটাই

তার দাবিমাফিক পুরোমাত্রায় কার্যকর এমন বলা যায় না।

সব মিলিয়ে, এ কথা বলাই যায় স্রেফ ফ্যাশন হিসেবে সানস্ক্রিন মাখা খুব কাজের কিছু নয়, অন্তত আমাদের দেশে। প্রয়োজনে সানস্ক্রিন মাখা যেতেই পারে, তবে সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনি চটকের বাইরে গিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে। যদি ডাক্তারের কাছেই যান পরামর্শ নিতে তো তাঁকে প্রশ্ন করুন সানস্ক্রিন কেন লিখছেন, এবং ঐ সানস্ক্রিনটাই লিখছেন কেন; এবং প্রস্তুত থাকুন সানস্ক্রিনের কোনও বিশেষ ব্র্যান্ড আপনার পক্ষে যথাযথ নাই হতে পারে। সবশেষে, মনে রাখবেন সানস্ক্রিন আপনার কোনো রোগ বা অসুবিধা সারায় না, তা প্রতিরোধ করে। সুতরাং সানস্ক্রিন যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে তা পুরো সময়টার জন্যই ব্যবহার করুন। যেমন, যদি পুরীর সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ানোর সময় রোদে পোড়া আটকাতে চান তবে তা ব্যবহার করুন সমুদ্রতীরে বেড়ানোর পুরো সময় জুড়ে, আর যদি মেচেতার প্রতিরোধে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন তাহলে তা ব্যবহার করুন রোদে বেরোনোর সমস্ত সময় জুড়ে, সবদিনই।

চিকিৎসকেরা যে সব সানস্ক্রিন লোশন ব্যবহারের নিদান দেন তাকে পরিভাষায় 'প্রেসক্রিপশন সানস্ক্রিন' বলে। তাতে যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান থাকে তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এইরকম —

প্যারা অ্যামাইনো বেনজয়িক অ্যাসিড (পি এ বি এ) —কাপড়ে দাগ ধরায়।

ইথাইল হেক্সিল পি এ বি এ — এই জাতীয় যৌগগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত, কিন্তু রোদে এটি ভেঙে যায়। (ফটোআনস্টেবল) আলোকভঙ্গুর।

সিনোক্সেট — ঐ

ইথাইল হেক্সিল স্যালিসাইলেট — নিজে ইউ ভি রুখতে বিশেষ সক্ষম না হলেও অন্য যৌগের সঙ্গে মিলিত মলম/ লোশনে তাদের আলোকভঙ্গুরতা কমায়।

ট্রোলামিন স্যালিসাইলেট — ইউ ভি বি সামান্য আটকায় — কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্রিম/ লোশনটিকে সহজে জলে/ ঘামে উঠে যাওয়া থেকে বাঁচায়।

অক্সিবেনজোন — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইউ ভি এ ফিল্টার। এবং ফটো-অ্যালার্জিক স্পর্শজনিত একটিমাত্র কারণ হিসেবে সমস্ত ধরনের সানস্ক্রিন পদার্থের মধ্যে সম্ভবত এক নম্বর।

এভোবেনজোন — আলোকভঙ্গুর। অন্যান্য সানস্ক্রিন পদার্থের আলোকভঙ্গুরতা বাড়ায়।

মেনথাইল অ্যানথ্রানিলেট — কমজোরি ইউ ভি এ ফিল্টার। স্পর্শজনিত একজিমা হয় না বললেই চলে।

টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ও জিংক অক্সাইড — এরা স্পর্শজনিত একজিমা ঘটায় না। আলোকভঙ্গুর নয়। চামড়ায় অল্প সাদাটে আস্তরণ দেখা যায়।

এছাড়া এইসব কেমিক্যালে বিভিন্ন ঘনত্বে (ডাইলিউশন) ক্রিম বা লোশন বা জেল তৈরি করতে হয়। সেটি একটু চটচটে বা অসুবিধাজনক বা অতিরিক্ত ঘামের কারণ হতে পারে। ব্রণ হতে পারে।

বোরোলিন, ভেসলিন ইত্যাদি বাজারে চালু ক্রিম/ লোশনে সূর্য-সুরক্ষার কাজ আদৌ হয় না।

কসমেটিকস হিসেবে যেসব সানস্ক্রিন বাজারে চালু আছে তাদের ক্ষেত্রে কী কী উপাদান কত পরিমাণে আছে তা প্রায়শই কোম্পানি জানায় না। সুতরাং তাদের কার্যকারিতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। অনেক ক্ষেত্রে উপাদানগুলি কসমেটিকসের বোতলে লেখা থাকে — সেইসব উপাদানের অনেকগুলির (বা এমনকি সবগুলিরই কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত নয়।

তথ্যসূত্র :

বিশদ বিবরণের জন্য 'FITZPATRICK'S DERMATOLOGY IN GENERAL MEDICINE'-2008, 7th EDITION, McGraw Hill, New York-এর 'Photoprotection and Sun Protective Agents' (P- 2137 - 2142) দেখুন।

জঙ্গল ঘিরে দেওয়ার জন্যই কি সুন্দরবনের বাঘ গ্রামমুখী?

কাগজ খুললেই এখন বাঘের খবর। বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। তারপর তাকে ধরা এবং ছাড়ার রোমহর্ষক পর্ব। কাগজ এবং টিভিতে সবিস্তার বর্ণনা ও ছবি। এই সঙ্গেই বিশেষজ্ঞ অবিশেষজ্ঞ এবং অজ্ঞজনের গম্ভীর আলোচনা, ব্যাখ্যা। সেই সব আলোচনার নির্যাস বার করলে দেখা যাবে তিনটে তত্ত্ব উঠে আসছে। তার প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল জঙ্গলে বাঘ তার খাবার পাচ্ছে না, তাই লোকালয়ে হানলা চালাচ্ছে। দ্বিতীয় তত্ত্ব, সুন্দরবনের বাঘ মানুষখেকো, তাই গ্রামে ঢুকছে এবং তিন জঙ্গলের পরিবেশের নষ্ট হয়ে যাওয়া। বিশেষত সিডার নামক কড়ে জঙ্গলের অনেক জায়গাই গড়ের মাঠ।

সুন্দরবনের প্রতিবেশী হিসাবে, অনেকবার জলে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরির ফলে, যেটুকু জ্ঞান অর্জন হয়েছে, তা দিয়েই এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। নতুন নানা প্রশ্নও মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। অশোকদাকে প্রায়শই বলতাম আমাদের ভাবনা-চিন্তার কথা। অশোকদা উৎসাহ দিতেন, নানা প্রশ্ন তুলে খোঁজখবর নিতে বলতেন। একসঙ্গে কাজ করবেন বলে মনস্থও করেছিলেন। হঠাৎ মৃত্যু তাঁকে নিরস্ত করল। যাই হোক পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা সমস্যাটা কীভাবে বুঝেছি সে কথাই বলি। প্রথমেই আসি জঙ্গলে খাদ্যাভাবের কথায়।

বাঘের খাবারের ঘাটতি আছে কি নেই তা বহুচর্চিত। তবে যে বাঘগুলো ধরা পড়ছে (সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাতা ফঁদে) তাদের চেহারা দেখে স্বাস্থ্যবান বলেই তো মনে হয়। সংবাদপত্রে বা টিভি চ্যানেলে বাঘের ছবি যাঁরা দেখেছেন নিশ্চয়ই সহমত পোষণ করবেন। একথা ভুললে চলবে না, যে একমাত্র সুন্দরবনের বাঘ মাছ, কাঁকড়াও খায়, যার ভাঁড়ার এখনো কম নয়। দ্বিতীয় তত্ত্বটা একচোখোমিতে ভরা। জঙ্গলে চারপেয়ে জীবদের শিকার করতে বাঘকে অনেক কসরত করতে হয়, কিন্তু দু-পেয়ে জীবদের ক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধি প্রয়োগ করেই শিকারকে করায়ত্ত করা সম্ভব। এই দু-পেয়ে জীবেরা প্রায়শই অসহায় অবস্থায় থাকে জঙ্গলে, খাঁড়িতে কিম্বা নৌকোয়। এই কারণেই মানুষের দিকে লক্ষ্য বাঘেদের। সুস্বাদু মাংসের লোভে বাঘ আজ 'মানুষখেকো'। তাই গ্রামে ঢুকছে। তাই যদি হত তবে বুদ্ধিমান বাঘ গ্রামে ঢুকে ওত পেতে থেকে (জঙ্গলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে কখন মানুষের দুর্বল মুহূর্ত পাওয়া যাবে এই আশায়) অন্ধকার-ভোরে ওঁত মানুষজনদের যে কাউকে তুলে নিয়েই পগারপার

হতে পারত। কিন্তু বু-পেয়ে জীব কেন খাড় চড় পেয়ে জীবকেই প্রত্যহই আক্রমণ করে না, তার সম্যক্‌ নয় এটা বুঝতে পারলেই "য পলায়তি স জীবতি" এই নীতি পালন করার চেষ্টা চলায় মানুষের নীতি মেনেই। ঠিক সেই সময়েই মনুষ্য প্রাচীর বলে ওঠে — তুই হয়ত আমাদের কাউকে খাসনি কিন্তু তোর কাচ্চা-বাচ্চা, বাপ-ঠাকুরদা এদের মধ্যে কেউ কেউ তো আমাদের কাউকে কাউকে আক্রমণ করেছে বা খেয়েছে তাই ,...। বাঘের গ্রামে ঢোকার পর তার আচরণ থেকেই পরিষ্কার "সুস্বাদু মাংস"-র লোভে বা 'মানুষখেকো'-র তকমা নিয়ে সে গ্রামে ঢুকছে না।

সবশেষে আসে পরিবেশ ভাবনা, নদীর লবণাক্ততা, 'সিডর' নামক ঝড়ের প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি ধরেই নেওয়া হয় সুন্দরবনের জঙ্গলের মাঝখানটা ফাঁকা অর্থাৎ টাক পড়ে গেছে, তাহলে তো অসুবিধার চেয়ে সুখেই ঘরকন্না করার কথা বাঘ-বাঘিনীদের, জঙ্গলে যে জায়গাগুলোয় লবণাম্বু উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন প্রায় সেখানে তো ধানি ঘাস ভরে যাওয়ার কথা এবং আছেও। সেক্ষেত্রে জঙ্গলের খাদ্য শৃঙ্খল অটুট থাকার কথা। কীভাবে? ওই ধানি ঘাস খেতে হরিণ যাবে সঙ্গে সঙ্গে যাবে বাঁদর, শুয়োরসহ অন্যান্য প্রাণী। কাঁহাতক প্রায় রৌদ্রহীন, শূলোয় ভরা (লবণাম্বু উদ্ভিদের শ্বাসমূল যা মাটির ওপর উঠে আসে এবং মুখটা শক্ত ও সূঁচালো) জঙ্গলে থাকতে ভাল লাগে। একটু ফাঁকা জায়গা, যেখানে পড়ন্ত বেলায় একটু ছোটাছুটি কিতকেমি করা সহ খাদ্য সংগ্রহও করা যাব — এরকম মনোরম জায়গা কে না চায়! ঠিক এখানেই বাঘেদের শিকারের উপযুক্ত পরিবেশ। ঘন জঙ্গলের মাঝে মাঝে কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকলে খাদ্য শৃঙ্খল অটুট থাকার কথা। এই খাদ্য শৃঙ্খল বজায় রাখতে তথা প্রকৃতিও উদার হাত এগিয়ে দিয়েছে। বড় বড় নদীর চর। হাঁ, মানুষ নয়, এটা প্রকৃতির দান। গভীর জঙ্গলের প্রাণীগুলো যাতে চরাচর করতে পারে তাই চরেও ধানি ঘাস জন্মায় (লম্বায় ২-৩ ফুট হয়)। তাহলে প্রকৃতিতে বিপর্যয় কোথায় ঘটল? হাঁ, ঘটেছে এবং তা ঘটিয়েছে মানুষই, মানুষেরই স্বার্থে। কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে মানুষেরই কাছে যা প্রকৃতির প্রতিশোধও বটে। নাইলনের জাল দিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলা হচ্ছে যাতে বাঘ গ্রামে ঢুকতে না পারে, বাধা পেয়ে জঙ্গলে আবার ফিরে যাবে এই আশায়। এই পদ্ধতিটাই সম্ভবত বাঘ সহ অন্যান্য প্রাণীদের বাস্তুতন্ত্রে আঘাত ঘটাচ্ছে। ফলস্বরূপ বনকর্মী সহ গ্রামবাসীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। কখন কী হয় এই ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকতে হচ্ছে। এই নাইলনের জালই বাঘেদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং বাস্তুতন্ত্রও নষ্ট করছে। কীভাবে?

বাঘ জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে করতে বিভিন্ন কারণে নদীর কাছাকাছি আসবে এবং ভাটা থাকলে চরের কাছাকাছি হাঁটবেও, যা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জঙ্গলের ধারে এসে দেখবে তার কাছে অবাঞ্ছিত একটা বস্তু প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে। স্বভাবতই বাঘটি বার হওয়ার জন্য জালের গা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করবে এবং একটা সময় তার মনে হবে সে 'বন্দী'। যতই ভাল খাওয়া-দাওয়া হোক না কেন প্রকৃতি জগতে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম, কোনো প্রাণীই বন্দী থাকতে চায় না। ফলত জালের পাশ দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতেই থাকবে যতক্ষণ না সে নিজেকে 'মুক্ত' করতে পারছে। হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে বা বাঁকের মুখে সে যদি জঙ্গলমুখী হয়ে যায় তবে সে এ যাত্রায় ভুলেই গেল ব্যাপারটা, কিন্তু যদি তা না হয় তবে বিপত্তির চূড়ান্ত। খাঁড়ির মুখ দিয়ে কোন একটা সময় নিজেকে মুক্ত করে নদীর চরায় স্বাধীনতা উপভোগ করে আবার তার আবাসস্থলে ফেরার সময় সে দেখবে আবারও বন্দী। নিজের বাড়িতে ঢোকার রাস্তাই তো বন্ধ! আবার হাঁটা। এরই মধ্যে জোয়ারের জল বাড়তে শুরু করেছে, পরবর্তীতে জলে ভাসতে ভাসতে যে কোনো জায়গায় থিতু হওয়া তোসে বনাঞ্চল বা গ্রাম যাই হোক না কেন! নিত্যকার না হলেও প্রায়শই ঘটার কথা। নিজ ভূমিতে পরবাসী হওয়ার ঘটনা। এই কয়েক বছর আগেও প্রত্যক্ষ করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। একটা বাঘ সজনেখালি থেকে বার হয়ে নদীর চর হাঁটিতে হাঁটিতে সুধন্যখালির দিকে চলে আসে। সেই সময় সাংবাদিকদের একটা দল এই দৃশ্য দেখে ক্যামেরাবন্দী করতে থাকে। ফেরার পথ রুদ্ধ থেকে আক্রোশে মাঝেমাঝেই জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। অবশেষে বনকর্মীরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে সজনেখালি জঙ্গলে ঢুকতে সাহায্য করে অনেক কায়ক্লেশে। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেও যত দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে জালের বাইরে বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখা গেলেই রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে গ্রামবাসীসহ বনকর্মীদের। আতঙ্কে অনবরত জঙ্গলের ধার ধরে পটকা ফাটাতে হচ্ছে যাতে বাঘকে আবার নিজভূমে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অনবরত পটকার শব্দ আবার জঙ্গলের শান্তি বিঘ্নিত করে চলেছে।

চিত্রটা দাঁড়াচ্ছে : জাল ঘেরা জঙ্গল — বন্দী বাঘ সহ বন্যপ্রাণী — নদী থেকে কুমিরের জঙ্গলে ডিম পাড়া বন্ধ — বন থেকে চরে এসে খাবার বা শিকার ধরা সকলের নিষিদ্ধ — চরে বাঘের পায়ের ছাপ — পটকা ফাটানো — টহলদারি বাড়ানো — লোকচক্ষুর অন্তরালে ভাসতে ভাসতে বাঘের গ্রামে প্রবেশ। এই চিত্রটা কয়েক বছর আগেও কি কেউ ভেবেছিল?

মানুষের ভালর জন্যই জাল দিয়ে জঙ্গল ঘেরার ব্যবস্থা আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখে এবার ভাববার সময় এসে গিয়েছে যে, এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না। এ নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা দরকার। সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ — সমস্যাটা নিয়ে সবারই এগিয়ে আসা উচিত। জঙ্গল-ঘেরা ব্যাপারটা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কি না তা যাচাই করা দরকার।

বিজন ভট্টাচার্য

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং

'লাল দন্ত মঞ্জন' আয়ুর্বেদ ওষুধ নয়

বিজ্ঞাপনে যা-ই দেখাক, বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদের তৈরি 'লাল দন্ত মঞ্জন' আদৌ কোনো আয়ুর্বেদীয় ওষুধ নয়। আসলে এটি নিছক একটি প্রসাধনী সামগ্রী। সুপ্রিম কোর্ট এমনটাই মনে করে। প্রস্তুতকারক সংস্থাটি দীর্ঘদিন মাজনটিকে আয়ুর্বেদীয় ওষুধ বলে দাবি করে আসছিল। এর বিরুদ্ধে আবেদন করে শুল্ক দপ্তর জানায়, বৈদ্যনাথের দাবির উদ্দেশ্য কর ফাঁকি দেওয়া। মামলাটির সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। সর্বোচ্চ আদালত বলে, লাল দাঁতের মাজন যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় আর পাঁচটা প্রসাধন দ্রব্যও সেভাবেই তৈরি হয়। আর, কোন ওষুধ কোন শ্রেণীভুক্ত হবে, অর্থাৎ সেটি আয়ুর্বেদ না চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ, তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট কিছু মাপকাঠি চালু পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর। বলাই বাহুল্য, লাল দাঁতের মাজন প্রস্তুত করতে এর কোনোটাই মানা হয় না। তাই লাল দাঁতের মাজন আর শুল্ক ছাড় পাবে না।

সংবাদ সূত্র, দি ইকনমিক টাইমস

কলকাতা - ২৩/০৪/২০০৯

গণপতি : এক অবহেলিত জাদুকর

সমীরকুমার ঘোষ

ভারতের জাদু-ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। 'বেদে'ও উল্লেখ আছে। রাজা ভোজ তো কিংবদন্তী। দৈব বা অশুভ শক্তির জোর দেখানো, গুরুগিরি ফলানো, সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে বশ করা এবং রসে-বশে থাকা — নানা কাজেই সাহায্য করে এসেছে জাদুবিদ্যা। গুরুরা অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছেন, বেদেরা তাগা-তাবিজ বেচেছেন — এরই আশীর্বাদে। তবে বিনোদনের জন্য জাদুবিদ্যার চল খুব বেশিদিন হয়নি। এর শুরু উনবিংশ শতাব্দী থেকে বললে খুব একটা ভুল হয় না। গোটা ভারতের কথা ছেড়ে এই বাংলার কথা ধরলে, তারও জাদু-ঐতিহ্য, বিশেষত বিনোদন-ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো। এখানে শুধু বিশ্বমানের জাদুকররাই ছিলেন না, জাদুকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বহু ক্লাব, প্রতিষ্ঠান। নিয়মিত বই ও পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার জাদুচর্চার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন পি সি সরকার। কিন্তু তাঁর আগে জনপ্রিয়তম দুটি নাম ছিল গণপতি চক্রবর্তী এবং রাজা বোস।

১৯০৬ সালে মার্কিন জাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন কলকাতায় জাদুর খেলা দেখিয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অনেক ভক্ত-শিষ্যও গড়ে ওঠে। যাঁর অন্যতম ছিলেন 'প্রফেসর বি', প্রমথ গাঙ্গুলি। তবে থার্সটন আসার অনেক আগেই বাংলায় জাদুচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের শেষ বছরে ফরাসি দেশের রাজধানীতে জাদুকর সত্যচরণ ঘোষ খেলা দেখিয়ে এসেছিলেন। বিদেশ থেকে অনেক যন্ত্রপাতিও এনেছিলেন। তবে তারও আগে কলকাতার দর্জিপাড়ায় ১৮৭০ সালে গড়ে উঠেছে 'উইজার্ডস ক্লাব' তৎকালীন দুই বিখ্যাত জাদুকর নবীনচন্দ্র মান্না ও অম্বিকাচরণ পাইকের উদ্যোগে। জাদুবিদ্যার প্রসারে এই ক্লাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তৎকালীন সেরা জাদুকররা প্রায় সবাই ছিলেন এর সদস্য। নবীনচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র এবং তাঁর পুত্র রাসবিহারী মান্না (মান্না দ গ্রেট) ও অম্বিকাচরণের ভাই গোকুলচন্দ্র ক্লাবের হাল ধরেন।

১৯২২ সালে ক্লাবের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হন জাদুকর 'রেনন' রণেন দত্ত। ক্লাবের অন্যতম সভ্য ছিলেন তখনকার 'জাদুসম্রাট' গণপতি চক্রবর্তী, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট জাদুকর বিমল গুপ্ত, 'ওসাকা রে' অশোক রায়, 'গনেন' গোলোকবিহারী ধর প্রমুখ। পরে রাজা বোসও যোগ দেন। যোগ দেন 'ভোম্বাক' নরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, 'প্রফেসর কুমার' গীতেন্দ্রনাথ কুমার প্রমুখ। বিশিষ্ট চিকিৎসক কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'আকর্ষণী' নামে এক সংস্থা। সেতারশিল্পী-জাদুকর বিমলাকান্ত রায়চৌধুরি, ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন সদস্য। বাঙালি জাদুকরদের আরেক বিশিষ্ট নাম যতীন্দ্রনাথ রায়, যিনি 'রয় দ্য মিস্টিক' নামে পরিচিত ছিলেন এবং জাদুকর দেবকুমার। অশোক রায় 'যাদুচক্র' গড়ে তোলেন। প্রকাশ করেন 'যাদু' নামে এক মাসিক পত্রিকা, ইংরেজি ও বাংলায়। জাদুকর অশোক সরকার প্রকাশ করেছিলেন 'ম্যাজিক' নামে এক ইংরেজি মাসিক পত্র। প্রকাশিত হয়েছে আর পি ঘোষের 'মায়া-জাল', লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সম্পাদনায় 'ম্যাজিক নেট', বি দাসের 'ম্যাজিক' ইত্যাদি। শীতা মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'মায়ামঞ্চ'। মায়ামঞ্চ অজিতকৃষ্ণ বসুর 'যাদু-কাহিনী'-সহ বেশ কিছু বই প্রকাশ করে। জাদু সরঞ্জামও তৈরি করত। অজিতকৃষ্ণ ওরফে অ-কৃ ব 'যাদু-কাহিনী'-তে বাংলা তথা বিশ্বের জাদুবিদ্যা ও জাদুকরদের মূল্যবান তথ্যাদি জানিয়ে গিয়েছেন তাঁর অসাধারণ ভঙ্গিতে। তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন —

'বাংলার যাদুজগৎ অবিস্মরণীয়ভাবে ঋণী যাদুকর গণপতির কাছে। তাঁরই দৌলতে যাদুবিদ্যা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জনগণের কল্পনাকে নাড়া দিয়েছিলো। 'গণপতি' আর 'যাদু' দুটি শব্দ সেকালে সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো জনমানসে। তাই বাংলা দেশে গণপতিকে আধুনিক যাদু-চর্চার জনক বলা যেতে পারে। গণপতি - প্রবর্তিত ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, শুধু তাই নয়, প্রশস্ততর করে দিয়েছেন, বর্তমান ভারতের বৃহত্তম যাদুকর পি. সি. সরকার।'

যাদুকর পি সি সরকারকে চেনে না এমন বাঙালি না জানে! কিন্তু বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছেন যাদুকর গণপতি। উপেক্ষা আর অনাদরের স্তূপ সরিয়ে সেই প্রতিভাবান জাদুকরকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্যই এই লেখা। বাংলার জাদু-ঐতিহ্য কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের ওপর ভর করে নেই। তাকে ঋদ্ধ করেছেন অসংখ্য জাদুশিল্পী, জাদুরসিক। প্রসঙ্গত সে কথা জানানোর জন্যই একটু বিস্তৃত ভূমিকা করতে হল। গণপতির কথা এই জন্যই যে তাঁর প্রতি ঋণ স্বীকার দূরস্থান তাঁকে সচেতনভাবে উপেক্ষা করা তথা ছোট করার প্রয়াস এখনও জারি আছে।

নিন্দুক : গণপতি চক্রবর্তীকে চেনেন?

সংশয়ী : কোন্ গণপতি? ওই যে বি টি রোডের ওপরে বিধানচন্দ্রের মতো দেখতে যাঁর স্ট্যাচু রয়েছে?

নিন্দুক : ওঁর নাম গণপতি শূর। গণপতি চক্রবর্তী সিঁথির ওই অঞ্চলেই থাকতেন। উনি ছিলেন একজন জাদুকর। জাদুকর বললে হয়ত ওঁকে একটু ছোটই করা হয়, উনি ছিলেন জাদুকরদের জাদুকর।

সংশয়ী : এটা বলা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না! জাদুকরদের জাদুকর বলতে আমরা জাদুসম্রাট পি সি সরকারকেই বুঝি। মানে প্রতুলচন্দ্র সরকার। গণপতি যদি অত বড় জাদুকরই হবেন, তো ওঁর নাম তো তেমন শোনা যায় না! এই আপনার মুখেই শুনছি। না, না দাঁড়ান, মনে হচ্ছে ছেলেবেলায় বাবার মুখেও নামটা শুনেছি এক-আধবার।

নিন্দুক : জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী ছিলেন পি সি সরকারের গুরু।

সংশয়ী : এবার সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! দেখুন, পি সি সরকারের লেখা বেশ কয়েকটি জাদুবিদ্যার বই আমার কাছে আছে— 'ম্যাজিকের খেলা', 'মেসমেরিজম', 'ইন্দ্রজাল'। বইগুলোর শুরুতে জাদুকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আছে। কিন্তু কোথাও তো গুরু হিসাবে গণপতির নামের উল্লেখ নেই! উপরন্তু ওঁর নাতনি মানেকা একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে, তা থেকেই জানা যায়, ওঁরা বংশানুক্রমেই জাদুকর। আর গণপতি গণপতি করছেন, প্রতুলবাবুর পুত্র জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'আমার বাবা পি সি সরকার' শিরোনামে এক মস্ত লেখা লিখেছেন। তাতেও তো কোথাও উল্লেখ নেই যে জাদুকর গণপতি তাঁর বাবার গুরু ছিলেন! জুনিয়র কী লিখেছেন শুনুন, 'গণপতি চক্রবর্তী, রয় দ্য মিস্টিক থেকে শুরু করে রাজা বোস, প্রফেসর যতীন সাহা, মন্মা দি গ্রেট প্রমুখ জাদু-ব্যক্তিত্ব। স্ব-মহিমায় তাঁরা নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্রতিভাবান কৃতী সন্তান। কিন্তু ইতিহাসে স্থান করে নিয়ে শিল্প, সাহিত্য এবং সংবাদের শিরোনামে উঠে ম্যাজিককে হাতিয়ার করে রূপকথাময় জীবন বানাতে কেউই লোককথা, লোকগাথা এবং কল্পলোকের নায়ক হওয়ার মাত্রায় গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। বরঞ্চ 'ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক' হিসেবে উঁচু মহলে একটা মৃদু চাপা বিদ্রূপের উপাদান হয়েছিলেন।... গণপতিবাবু ছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ব্রাদার্সের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার এবং মুক্তিরসের জাদুবিদ্যার এক বাঙালি সামাজিক কম্প্রোমাইজ। দিশি খদ্দেরের বাইরে অন্য প্রদেশে এবং বিদেশিদের কাছে তাঁদের প্রোগ্রাম সমাদৃত হয়নি। ... গণপতিবাবু ম্যাজিক দেখিয়েছেন সার্কাসের তাঁবুতে, একটা উপাঙ্গ হিসেবে। সার্কাসের ট্রাপিজ শিল্পীদের বা চক্কার ওপর মোটরসাইকেল চালক শিল্পীদের নামও যেমন জানি না, তেমনি সমাজে, সাহিত্যে অবহেলিত চেহারায় ছিল ম্যাজিক। গণপতিবাবু বা অন্যান্য বাঙালি বা অবাঙালি ভারতীয় জাদু প্রদর্শকদের ওই জাতীয় প্রদর্শনীর পাশাপাশি এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালেও মঞ্চমায়ার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান হিসেবে কেউই ভারতবর্ষে প্রদর্শনী করেননি। ...

নিন্দুক : এরপর হার মানা ছাড়া আর উপায় থাকার কথা নয়। কারণ বিশ্বনন্দিত পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর ওপর কথা বলার হিম্মত রাখে কে! তবু ...

'অনেকদিন পূর্বে যখন যাদুকর গণপতির অদ্ভুত যাদুবিদ্যা দেখিয়াছিলাম তখন বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে বাঙ্গালীও এত অদ্ভুত যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ। তৎকালে থ্রাস্টন, গ্রগী, কার্টার ও নিকোলা প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী ঐন্দ্রজালিক ছাড়া আর কেহ এই বিদ্যায় এতদূর বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। যাদুকর গণপতিকে হাত-পা বদ্ধ করিয়া সকলের পরীক্ষিত একটি থলির ভিতর বদ্ধ করিয়া একটি সকলের পরীক্ষিত বড় বাক্সে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রফেসার গণপতি চক্রবর্তী মুহূর্তে ঐ বাক্স হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন ও পুনঃপ্রবেশ করিতেন। এই ক্রিয়া সম্পাদন এত ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার সহিত তিনি করিতে সমর্থ হইতেন যে দর্শকমণ্ডলী শত চেষ্টাতেও উহার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। যাদুকর গণপতির আর একটি বিস্ময়কর খেলা ব্ল্যাক আর্ট (Black Art): দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল আলোক — আবার গাঢ় অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারময় গৃহে নরকঙ্কালের আবির্ভাব — হাঃ - হাঃ - হিঃ - হিঃ — অট্টহাস্যে রঙ্গমঞ্চ ঘনঘন আলোড়িত হইতে থাকে — তারপর সেই নৃত্যপরায়ণ কঙ্কালগুলি মিলিয়া একটি নারীমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। চেয়ার টেবিল চায়ের কাপ ডিস সমস্তই শূন্যে উড়িয়া আসে যায় — একটি ভয়ঙ্কর মড়ার মাথা সিগারেট কাড়িয়া লইয়া ধূমপান করে। মুঠি মুঠি ধূলি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন সুন্দরী নারীমূর্তি আবির্ভূত হয়। হাঁসের ডিম হইতে হাঁস, ও পায়রার ডিম হইতে পায়রা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে। ইহা যেমন ভয়াবহ তেমনই রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়জনক। এইরূপ অদ্ভুতকর্মা ঐন্দ্রজালিককে পাইয়া বাংলাদেশ বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করিত।' ১৯৩৪ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'যাদুবিদ্যায় বাঙ্গালী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেই লেখার শুরুই হয়েছে গণপতি চক্রবর্তীকে নিয়ে।

সংশয়ী : এমন লেখা যে কেউ যে কোনো পত্রিকায় লিখে ছাপিয়ে ফেলতে পারে। তাতে সত্যিই কিছু প্রমাণিত হয় না।

নিন্দুক : কথাটা খাঁটি। তবে তথ্যটার সঙ্গে আর একটু যোগ করলে বোধ হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। পি. সি. সরকার-এর 'সহজ ম্যাজিক' নামে একটি বই এ মুখার্জী এন্ড ব্রাদার্স একসময় ছেপেছিল। খেয়াল রাখুন বইয়ের লেখকের নাম। সেই বইয়ের পরিশিষ্ট হিসাবে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ভাবে উদ্ধৃত করা হয়। প্রসঙ্গত লেখাটি থেকে আর একটু পাঠককে জানাবার ইচ্ছা সংবরণ করা যাচ্ছে না — 'আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে যাদুকর সরকার অর্থাৎ অধুনা-প্রসিদ্ধ 'যাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার ভুবনবিখ্যাত যাদুকলাসম্রাট গণপতি চক্রবর্তীরই শিষ্য। উঁহার নিকট হইতে শৈশবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই তিনি যাদুবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। উঁহার এই অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টার মূলে ছিলেন গণপতি স্বয়ং। যাদুসম্রাট সরকারের যাদুবিদ্যার সাফল্যে গুরু গণপতিই সর্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। কারণ শাস্ত্রে আছে যে সর্ব্বত্র জয়ের ইচ্ছা করিলেও পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় আশা করিবে। সেইজন্যই বোধ হয় গণপতি নিজেই সরকারকে 'যাদুসম্রাট' ও 'কৃতিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাদুকর পি. সি. সরকারের নাম-যশঃ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বহু পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়া ছিলেন "আমার ছাত্রসমূহের মধ্যে কৃতিত্বে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তোমার যাদুসম্রাট নাম সার্থক করিয়াছ, — আশীর্ব্বাদ করি আরও পারদর্শী হইয়া আমার ও দেশের নাম অধিকতর উজ্জ্বল কর।" সুধী পাঠক, স্মরণে রাখুন লেখাটি পি সি সরকারের লেখা বইতে ঠাঁই পেয়েছিল। 'ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক' গণপতি কিঞ্চিৎ প্রশংসিতই হয়েছিলেন। কেমন জাদুকর ছিলেন গণপতি? তাঁর দৌড় কি সার্কাসের ফাঁকে খেলা দেখানোতেই সীমাবদ্ধ ছিল? পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতি-চিত্রণ'-এর পাতা উল্টে তা থেকে কিছুটা তথ্য পেশ করা যাক।

'শান্তিনিকেতনে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক, দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা (ইলিউশন বক্স)। এই আসরে

রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক যাদুকর আরেক যাদুকরের সামনে বসে আছেন।... ইলিউশন বক্সটি ছিলো একটি বড়ো কাঠের বাকসো। খেলা আরম্ভ হবার আগে সন্তোষ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালোভাবে বাকসোটি পরীক্ষা করলেন। গণপতির দুখানা হাত পিছমোড়া করে এবং দুখানা পাও কষে বাঁধা হলো। তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বেঁধে সেই বাকসে পোরা হলো, বাকসোটি চারদিক থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে বাকসোর সামনে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা ভেদ করে দুখানা হাত বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুটি সরে যেতেই পর্দা সরিয়ে দেওয়া হলো, দেখা গেলো বাকসো বন্ধই আছে। বাক্সের ওপর বাঁয়া-তবলা রেখে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেই দর্শকদের ফরমায়েস মতো তাল বাজতে লাগল বাঁয়া-তবলায়। ভুতুড়ে ব্যাপার! পর্দা সরে গেলো, বাকসো পূর্ববৎ। আবার পর্দার আবরণ। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন। বলা হলো, আপনারা যাদুকরকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিন যেন ঐ চিহ্ন দেখে চিনে নিতে পারেন। যাদুকরকে কেউ পরিয়ে দিলেন আংটি, কেউ চশমা। যাদুকর পর্দার আড়ালে যেতেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলো। দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাকসো খুলে, মুখ বাঁধা থলি খুলে দেখা গেলো দর্শকদের দেওয়া আংটি আর চশমা পরা অবস্থায় থলের মধ্যে রয়েছেন তেমনি হাত-পা বাঁধা যাদুকর গণপতি।' অজিতকৃষ্ণ বসুর (অ-কৃ-ব) জাদুকাহিনী-তেও এই কাহিনী উল্লিখিত। তিনি আরও অনেক কিছু লিখেছেন গণপতিকে নিয়ে। পরিমলবাবুর লেখা থেকে জানা যায়, গণপতি শুধু সার্কাসের উপাঙ্গ হিসাবেই যাদু দেখাতেন না। তবে এটা ঘটনা তাঁর জাদুখেলা দেখানোর শুরু সার্কাসেই। প্রফেসর বোসের ভারত-বিখ্যাত 'বোসেজ সার্কাস'-এ গণপতি তাঁর জাদুর খেলা দেখাতেন। ওই সার্কাসে সুশীলা নামে এক বাঙালি মেয়ে বাঘের খেলা দেখাতেন। এটাই ছিল মুখ্য আকর্ষণ। পরে গণপতি যখন তাঁর বিখ্যাত ইলিউশন বক্স এবং ইলিউশন ট্রী-র খেলা দেখাতে শুরু করলেন, তখন তিনিই হয়ে উঠলেন বোসের সার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সার্কাসের অন্য সমস্ত খেলা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো গণপতির অবিশ্বাস্য অলৌকিক বাক্সের খেলার কাছে। শেষ পর্যন্ত শুধু ঐ বাক্সের খেলা — যা দেখবার জন্য লোক পাগল, দেখিয়ে গণপতি মাসে তিনশো টাকা পেতে লাগলেন। তখনকার দিনের তিনশো টাকা মানে এখনকার অন্তত হাজার টাকা। সেই ১৯৬২ সালে একথা লিখেছেন অজিতকৃষ্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এখন 'জাদুসম্রাট' বিশেষণটি পি সি সরকার-এর একচেটিয়া হয়ে গেলেও তাঁর আগে গণপতি চক্রবর্তীকেই যাদুসম্রাট বলা হত। 'অশিক্ষিত' গণপতি আপন প্রতিভাবলে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জাদুকরই হয়ে ওঠেননি, পি সি সরকার ছাড়াও তৈরি করেছেন জাদুসূর্য দেবকুমার, এ সি সরকার, কে লাল প্রমুখ খ্যাতিমান শিষ্যমণ্ডলী। শ্রীরামপুর চাতরা নিবাসী জমিদারপুত্র গণপতির ভবঘুরে জীবন, সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা থেকে সার্কাসে চাকরি এবং শেষমেশ জাদুকর হয়ে ওঠার বর্ণময় জীবনকথা আগামী সংখ্যায়।

জাদু ও রবীন্দ্রনাথ

জাদু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ খুব ছোটবেলা থেকেই। জীবনস্মৃতিতে এবং কবিতায় তার উল্লেখ আছে।

'আর একটি ছাত্র সম্বন্ধে কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। তাহার বিশেষত্ব এই যে, ম্যাজিকের শখ তাহার অত্যন্ত বেশি। এমন-কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একখানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছে, এমন ছাত্রকে ইতিপূর্বে আর-কখনো দেখি নাই। এজন্য অন্তত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্ষরের খাড়া লাইনের মধ্যে কোনো রূপ মিথ্যা চালানো যায়, ইহা আমি মনেই করিতে পারিতাম না।'

(জীবনস্মৃতি, পৃ: ৩৫)

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চার দিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা সেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
দুটো বেগুন, একটা চড়ুই-ছানা।
জামের আঁটি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটা মাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা।
টুকরো বাসন চিনেমাটির,
নুড়ো কাঁটা খড়কে কাঠির,
নলচে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা —
ঠিকানা নেই আগুপিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

[কবি 'খাপছাড়া'-র এই ভূমিকা লিখেছিলেন ১৩৪৩ সালে। মানে ইংরেজির ১৯৩৬ নাগাদ। গণপতির জাদু কি ওঁকে এই লেখায় প্রভাবিত করেছিল? গণপতি প্রয়াত হন ১৯৩৯ সালে।]

সূর্যগ্রহণ দেখার সুযোগ একদম ছাড়বেন না

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

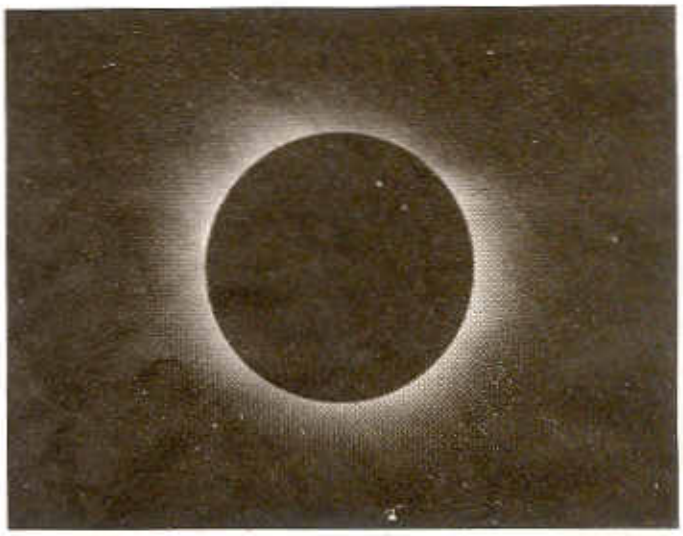

সূর্যগ্রহণ নিয়ে কেন লিখছি, আগে বলে নিই। এই বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বৎসর' হিসাবে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ সংস্থা — ইউ এন ও, ইউনেসকো এবং আই এ ইউ। শেষেরটির সঙ্গে অনেকের বোধ হয় পরিচয় নেই, আই এ ইউ হল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন — পৃথিবীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ সংস্থা। এর সদর দপ্তর প্যারিসে। কিন্তু এমন একটা সিদ্ধান্তের কারণ কী? কারণ হল গ্যালিলিও। গ্যালিলিও ৪০০ বছর আগে ১৬০৯ সালে তাঁর নিজের তৈরি টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এই ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের সূচনা হিসেবে পরিগণিত। এতদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হত খালি চোখে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের ওপর। এই প্রথম টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশকে চোখের সামনে একেবারে নামিয়ে আনলেন গ্যালিলিও, আর এখান থেকেই টেলিস্কোপভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত। বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তকে আভাসিত করেছিলেন গ্যালিলিও, আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে আনলেন এক বিপ্লব। সেইজন্যেই ৪০০ বছর পরে ২০০৯ সালটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বৎসর' হিসেবে।

এখানেই শেষ নয়, এ বছর ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হতে চলেছে। ২২ জুলাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে, আর সেই গ্রহণের ছায়াপথ চলে যাবে ভারতের অনেকগুলো বড় শহর ও জনাকীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে। যেমন সুরাট, বরদা, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভূপাল, বারাণসী, গয়া, পাটনা, দার্জিলিং, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, গ্যাংটক, ডিব্রুগড় ও ইটানগর। এটি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে দেখতে পাওয়া যাবে, তা ঘটবে ২১১৪ সালের ৬ জুন অর্থাৎ প্রায় ১০৫ বছর পরে। আরও একটা ব্যাপার আছে, এই গ্রহণ হবে এই শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, পূর্ণগ্রস্ত অবস্থার সর্বাধিক স্থায়িত্ব হবে ৬ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড। বহুদিনের গ্রহণ সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলো পরিত্যাগ করে, ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর, ডায়মন্ডহারবারে প্রায় দেড় লাখ লোক জমায়েত হয়েছিলেন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য। আশা করছি ২২ জুলাই যে গ্রহণটি হতে চলেছে, তা দেখার জন্য অনেকেই এখন থেকে পরিকল্পনা করছেন, আর সেইজন্যেই এই লেখা।

মানুষ তার জীবনবৃত্তের কেন্দ্রে রেখেছিল সূর্যকে, পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করত নতুন সূর্যের জন্মের মহিমা, আর সেই সূর্য অস্ত গেলে রাত্রির মধ্যে মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। দিনের আলোয় সে তখন তার সব কাজ সেরে ফেলত, আর রাত্রি এলেই কেমন যেন একটা ভয় ও ভীতি, তাই গুহার মধ্যেই থাকতে পছন্দ করত। যেদিন থেকে মানুষ চেতনা পেয়েছে, সেদিন থেকেই তার কাছে সূর্য ওঠা যেন দেবতার আবির্ভাব। তাই যুগ যুগ ধরে সূর্যের আরাধনা আজও পৃথিবীর নানান দেশে চালু আছে।

সভ্যতার উন্মেষের সূত্রপাতেই মানুষ জেনেছিল, সৌরশক্তি সকল পার্থিব প্রকৃতির নিয়ন্তা, জড় ও জীবের মূলে আছে সূর্যের তেজ। দিনের আকাশে মহাদ্যুতিময় সূর্যই একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আর এই আলোর দরুনই মানুষের এতরকম খাবার তৈরি হয়, যেমন ফুল, ফল, শস্য ইত্যাদি। তাই দিনদুপুরে আকাশ থেকে সূর্যের উজ্জ্বল চাকতিটি ধীরে ধীরে কালো হয়ে গিয়ে অকাল-রাত্রির অবতারণা হলে, মানুষের কাছে তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অশুভ এবং ভীতিপ্রদ বলে মনে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই মনে করা হয় সূর্যগ্রহণ হল সূর্যদেবতার রোষের প্রকাশ, কোথাও তা অত্যন্ত অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত। খেয়াল রাখতে হবে, প্রাচীন কালের মানুষের জানা ছিল না, সূর্যগ্রহণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ। এই অজ্ঞতা, পৃথিবীর নানান দেশে জন্ম দিয়েছিল সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত নানান কুসংস্কার।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সমাজের মাথা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা। তাঁরা চালু করলেন — সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণ হল দেবতাদের রাগের একটা প্রকাশ, এই রাগকে প্রশমিত করতে হবে, তাই গ্রহণ ঠিক শুরু হওয়ার সময় একবার গঙ্গায় স্নান করা, আবার গ্রহণের অন্তিম সময়ে আর একবার স্নান করা। এরকম স্নান করলে দেবতার রাগ একটু কমবে, খানিকটা পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। পরবর্তী সময়ে পুরোহিতরা বললেন, শুধু স্নান করলেই চলবে না, আরও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, গ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনওরকম খাওয়াদাওয়া চলবে না। আরও পরে কিছু পুরোহিত চালু করলেন, আরও খানিকটা কষ্ট স্বীকার করলে দেবতার রাগ আরও প্রশমিত হবে, গ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা চলবে না। এমনও প্রচারিত হয়েছিল, দিনদুপুরে অকালরাত্রির অবতারণা, আকাশে সূর্য নেই, তাই এর ফলে রান্না করা খাবারদাবার সব বিষাক্ত হয়ে যায়, তাই কোনওরকম রান্না করা

খাবার খাওয়া চলবে না। এই বিধি যখন চালু হল, তখন মিঠাইয়ের দোকানের মালিকেরা প্রমাদ গুনলেন, তারা দেখলেন গ্রহণের আগে যেসব মিঠাই তৈরি হয়েছে সেসব ফেলে দিতে হয়, আর তাতে বেশ বড় রকমের অর্থের ক্ষতি; তখন তাঁরা সমাজের উঁচু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পুরোহিতদের কাছে গিয়ে বিশেষ

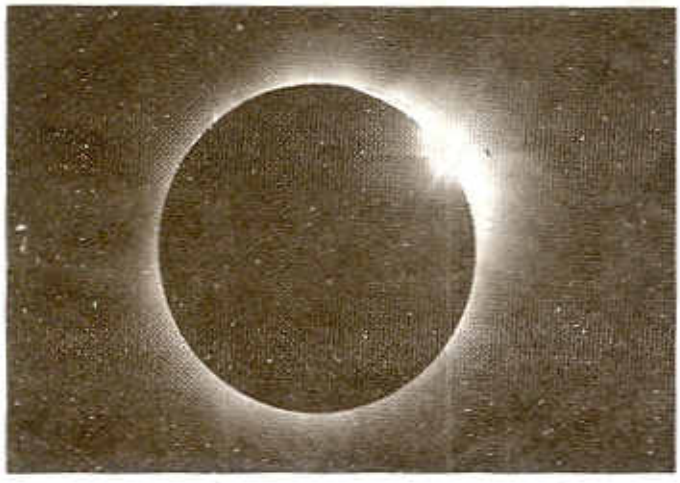

অনুরোধ করলেন, এর একটা বিহিত করার জন্যে, আর এর জন্যে মিঠাই দোকানের মালিকেরা পণ্ডিতদের বেশ ভালোরকম প্রণামী দিতেও স্বীকৃত হলেন। তখন পণ্ডিতেরা নতুন বিধি উদ্ভাবন করলেন, গ্রহণের আগে অথবা ওই সময়ে যেসব খাবার তৈরি হয়েছে তার ওপর একটি করে তুলসীপাতা রেখে দিতে, তুলসীপাতা খাবারের সব অমঙ্গল দূর করে দিতে সমর্থ। এইভাবে আমাদের দেশে গ্রহণ নিয়ে নানারকম কুসংস্কার প্রচলিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আরও বেশি গোঁড়া ছিলেন। তাঁরা বললেন, সূর্যগ্রহণ চলাকালীন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, এমনকি জানালা দরজার ফুটো বা ফাঁক কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে বাইরের কোনও আলো ঘরে ঢুকতে না পারে। মোটকথা সূর্যগ্রহণ দেখা কোনোরকমেই চলবে না। এইরকম সব কুসংস্কার প্রচলিত হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষ সূর্যগ্রহণ দেখার কোনওরকম চিন্তাও করতেন না। এইসব কুসংস্কার বংশপরম্পরায় পরবর্তী সময়ের মানুষের মধ্যেও গেঁথে যায়, আর আজও আমরা দেখতে পাই তার প্রভাব।

১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার ওপর দিয়ে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ছায়াপথ চলে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই তারিখের আগে ভারত থেকে যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল তা হল ১৮৯৮ সালের ২২ জানুয়ারি অর্থাৎ ১৯৮০ সালের গ্রহণ ছিল ৮২ বছর পরে। আমি তখন পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের ডিরেক্টর। আমার সেন্টারের পাঁচজনের একটি দল নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নানগোণ্ডা শহরের একেবারে পাশে, একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য শিবির স্থাপন করি। গ্রহণ দেখার জন্য স্থানটি ছিল অনবদ্য, কারণ পাহাড়ের ওপর থেকে বিস্তীর্ণ দিকচক্রবাল দৃশ্যমান, কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। সুন্দর আদর্শ স্থান বলে ওই পাহাড়ের ওপর পাঁচটি বিদেশী বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষন-শিবির ও হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের একটি শিবিরও স্থাপিত হয়েছিল। গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে থেকেই এবং গ্রহণ চলার পুরো সময়ে, বিদেশী বিজ্ঞানীরা কফি তৈরি করে নিজেরাও পান করছিলেন এবং আমাদের সকলকেও কফি পরিবেশন করে আপ্যায়িত করছিলেন, আমরা সকলেই ওঁদের দেওয়া ওই কফি পান করে বেশ আনন্দ করছিলাম এবং বিদেশী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এই পর্যবেক্ষণকে কেন্দ্র করে নানারকম আলাপ আলোচনা করছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ওসমানিয়ার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তামিল ব্রাহ্মণ, তিনি কিছুতেই গ্রহণের সময়ে কফি পান করলেন না, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কফি গ্রহণ করছেন না কেন, তার উত্তরে তিনি বললেন, অকালে মাতৃবিয়োগের ফলে তাঁকে ছোটবেলা থেকে মানুষ হতে হয় দিদিমার কাছে, আর দিদিমা ছোটবেলা থেকে এই ধারণা গেঁথে দিয়ে গেছেন, এটা উনি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অবাক হয়ে ভাবতে হয়, একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও, প্রায় ৫৫ বছর বয়সে তিনি কুসংস্কার ছাড়তে পারেননি, কী গভীর প্রভাব এইসব কুসংস্কারের মানুষের মনে। বর্তমানে শিক্ষিত মানুষ সকলেই সূর্যগ্রহণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছেন, কিন্তু তবুও দেখা যায় গ্রহণের সময়ে তাদের অনেকের ঘরেই, রান্নাবান্না বা খাওয়াদাওয়ার চল নেই। এখনো এই কুসংস্কার কী গভীরভাবে বিদ্যমান!

নানগোণ্ডার পাহাড় থেকে দেখেছিলাম, পাশেই নানগোণ্ডা শহরের কাণ্ডকারখানা। নানগোণ্ডা অন্ধ্রের একটি বড় জেলার সদর শহর, প্রায় তিন লাখ লোকের বাস। পাহাড়ের ওপর থেকে লক্ষ্য করলাম, শহরের সমস্ত মানুষ দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে, রাস্তায় কোনও যানবাহন চলছে না, মানুষ চলছে না। ফিরে এলাম কলকাতায়, শুনলাম ১৬ ফেব্রুয়ারি গ্রহণের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত কলকাতার সব যানবাহন বন্ধ ছিল, অধিকাংশ মানুষ এই গ্রহণ পর্যবেক্ষণের চেষ্টাও করেননি, ঘরে বসে দুপুর বেলায় টিভিতে 'পথের পাঁচালি' সিনেমা দেখেছেন। অবাক হয়ে গেলাম, ৮২ বছর পর একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ, কলকাতার যথেষ্ট কাছে পুরীতে গেলেই এই গ্রহণের পূর্ণ পর্যায় দেখা যেত, কিন্তু সেসব পরিকল্পনা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আসেনি। ১৯৮০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির গ্রহণ দেখার জন্য সারা ভারতের মিডিয়াও সেই সময় কোনওরকম সাহায্য করেননি, বরং যাতে মানুষ না দেখেন, সেই ব্যাপারেই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

ছবিটা পাল্টে গেল মাত্র ১৫ বছর পরে। ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হল, তার পূর্ণগ্রহণের ছায়াপথ, কলকাতার খুব নিকটে ডায়মণ্ডহারবার, হলদিয়া, উলুবেড়িয়ার ওপর দিয়ে চলে যায়। এই গ্রহণের আগে সমস্ত সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম দারুণভাবে প্রচার করেছে যাতে সাধারণ মানুষ এই পূর্ণগ্রহণের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেন এবং গ্রহণ দেখার জন্য কী কী সাবধানতা নেওয়া প্রয়োজন তাও বিশদভাবে প্রচারিত হয়। আমি নিজে স্লাইড দেখিয়ে গ্রহণের আগে চার মাসে প্রায় ৪৮টি লেকচার দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে টিভিতে একাধিক অনুষ্ঠান করেছি। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় লিখেছিও। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও অন্যান্য বিজ্ঞান ক্লাবগুলোও নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল। আর তার ফলেই ডায়মণ্ডহারবারে প্রায় দেড় লাখ লোক জমায়েত হয়েছিলেন এই সূর্যগ্রহণের পূর্ণ পর্যায় পর্যবেক্ষণের জন্যে — অভাবনীয় সাফল্য। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক যতরকম সৌন্দর্য আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মেরুপ্রভা (Aurora), আর তারপরেই হল এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অপরূপ দৃশ্য। আমি আশা করব, এই লেখাটি পড়ার পরে কিছু পাঠকের অন্তত ইচ্ছা হবে আগামী ২২ জুলাইয়ের পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখার জন্যে।

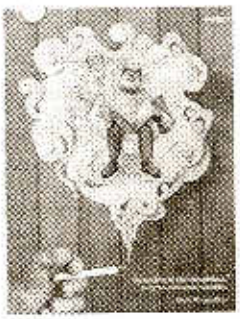

ক্যানসার : সাবধানের মার নেই

উৎপল সান্যাল

ক্যানসার রোগের ব্যাপকতা বোঝাতে শুধু এটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে ২০০৭ সালে বিশ্বে কমবেশি ১ কোটি ২০ লক্ষ জন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন নতুন রোগী হিসাবে আর মোটামুটি ভাবে ৭৫ লক্ষ জন মারা গেছেন। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে সেকেণ্ডেএকটি মৃত্যু হয়েছে। প্রতি আটটির মৃত্যুর একটি ক্যানসারের কারণেই হয়। শিল্পোন্নত দেশে ক্যানসারে মৃত্যু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে আর উন্নয়নশীল দেশে এটি তৃতীয় স্থানে। ভারতে প্রতি বছরে আনুমানিক দশ লক্ষ জন নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন আর মারা যাচ্ছেন ৫ লক্ষ জন অর্থাৎ প্রতি মিনিটে একজন। সারা পৃথিবীতে ক্যানসার রোগীর মোট সংখ্যা তিন কোটি হতে পারে অন্যদিকে ভারতে মোটামুটিভাবে ২২ লক্ষ ক্যানসার রোগী এই মুহূর্তে আছেন। অনুমিত হয়েছে ১৫-২০ বছর বাদে প্রতি বছর ১ কোটি মানুষ ক্যানসারে প্রাণ হারাবেন। এই সমস্ত তথ্য থেকেই এটা সুস্পষ্ট যে এই রোগের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সচেতনতা আর সাবধানতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিহাস : পৃথিবীতে মানুষ আসার অনেক আগেই ক্যানসার এসেছিল বলে মনে করা হয়। ৩৫ কোটি বছর আগেকার একটি মাছের জীবাশ্মে টিউমার দেখা গেছিল। ১৩-১৮ কোটি বছর আগেকার কোনো কোনো ডাইনোসরের ফসিলে ক্যানসারের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। প্রাচীন মিশরের পিরামিডে (২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রাপ্ত মমিতেও ক্যানসারের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। ভারত, চীন, মিশরের বহু পুরোনো পাণ্ডুলিপিতে কিছু রোগ লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া গেছে যেগুলির সঙ্গে ক্যানসারের লক্ষণের বিশেষ মিল আছে। এইরকম একটি পাণ্ডুলিপি হল সুশ্রুত সংহিতা (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০)। আধুনিককালে সুবিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রাটিস (৪৬০-৩৭৭ খ্রিস্টপূর্ব) এবং পরবর্তীকালে গ্যালে (১৩০-২০১ সাল) ক্যানসার রোগ বর্ণনা করেন। ক্যানসার শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক শব্দ Karkinos (অর্থ 'কাঁকড়া') → লাটিন Cancrum → ইংরেজি Cancer। সংস্কৃতেও একে কর্কট রোগ বলা হয়।

কীভাবে ক্যানসার হয় : আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চোখধাঁধানো সাফল্য সত্ত্বেও কোন পরিস্থিতিতে কার দেহে কখন ক্যানসার উৎপন্ন হবে তা এখনো সুনিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব হয় নি যদিও বিভিন্ন বাহ্যিক কারণ (যেমন তামাকের ব্যবহার, বিকিরণ, কিছু কিছু জীবাণু ও ভাইরাসের সংক্রমণ) এবং অন্তঃস্থ কারণ (মিউটেশন, ডি এন এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, হর্মোন এবং শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম) ইত্যাদির সঙ্গে ক্যানসারের উৎপত্তি প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষের শরীর বিভিন্ন ধরনের লক্ষ কোটি কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে। কোষগুলির এক অংশ প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে নতুন কোষের জন্ম হচ্ছে। সাধারণভাবে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে তার মত দুটি কোষের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রথম কোষটিকে বলা হয় জনিত্রী কোষ ও তার থেকে উদ্ভূত কোষকে বলা হয় অপত্য কোষ। দেহের বিভিন্ন কোষের আয়ুও বিভিন্ন যেমন, রক্তের লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা যথাক্রমে ১২০ দিন, ২-৩ দিন ও ১০ দিন বাঁচে। কোষ স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস হওয়াকে অ্যাপোপটোসিস (apoptosis) বলে। যদি পরিবেশগত বা শারীরবৃত্তীয় কারণে কোনো একটি কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ঐ কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি ক্ষতিগ্রস্ত অস্বাভাবিক কোষের জন্ম দেবে। সেখান থেকে ৪টি, ৮টি ইত্যাদি করে কোষ সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এইভাবে ৩০ বার বিভাজিত হওয়ার পর কোষসংখ্যা ১০০ কোটির কাছাকাছি হলে তার ওজন হয় ১ গ্রাম এবং আয়তন হয় ১ ঘন সেন্টিমিটার — তখনই বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে অতিরিক্ত কোষটিও বা টিউমারটিকে ক্যানসার বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত কোষ থেকে ক্যানসার উৎপন্ন হতে ৩-২০ বছর লেগে যেতে পারে কেননা বিভিন্ন কোষের মৃত্যুহার ও জন্মহার আলাদা আলাদা। ক্যানসারদুষ্ট কোষের মৃত্যুহার ভীষণ কম। টিউমার মূলত দুরকমের। বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট। বিনাইন টিউমার আস্তে আস্তে বাড়ে, এক জায়গাতেই আবদ্ধ থাকে এবং শরীরের বাইরের অংশে হলে ততটা ক্ষতিকারক নয়। অন্যদিকে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ক্যানসারের প্রবণতাই হল তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যাকে metastusis বলা হয়। ক্যানসারের কোষ নিকটবর্তী অংশেও ছড়িয়ে যায়। কাঁকড়া যেমন তার শিকারকে দাঁড়া দিয়ে আক্রমণ করে এবং দাঁড়াগুলো ক্রমশ ছড়িয়ে যায়, ক্যানসার কোষও সেইভাবে ছড়ায়। এছাড়া কোনো কোনো ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের আকৃতির সঙ্গে কাঁকড়ার চেহারার মিল দেখা গেছে। যে জন্য ক্যানসার বিপজ্জনক তা হল, শুরুতে ক্যানসারের প্রায় রোগলক্ষণ থাকে না এবং টিউমারটি বেদনাহীন। এছাড়া ক্যানসার বহু রকমের হতে দেখা যায় (দুশোরও বেশি) যারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও উপসর্গে আলাদা। এই বহুল বৈচিত্রই ক্যানসারকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। তবু এর মধ্যেও কিছু সাধারণ ধর্ম দেখা যায় যেগুলি হল (১) রোগাক্রান্ত কোষগুলির বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত, অস্বাভাবিক ও সুস্থ কোষকে ধ্বংস করতে পারে (২) কোষগুলি রক্ত, লসিকা (lymph) ইত্যাদি সংবহনের মাধ্যমে দূরবর্তী অংশে ছড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধি পেতে পারে (৩) কোষগুলি অপ্রয়োজনীয়, অপরিণত হয় এবং যেমন আগে বলা হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে ভুলে যায়। ক্যানসার ছোঁয়াচে বা সংক্রামক নয়।

কারণ : ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্য উঠে এসেছে যেমন ১৭০০ সালে ইতালীয় চিকিৎসক ডাঃ বার্জার রামাজিনি লক্ষ্য করেন সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে স্তন ক্যানসারের হার বেশি। পরবর্তীকালেও দেখা যায় দেরিতে গর্ভধারণ বা আদৌ গর্ভধারণ না হলে মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ১৮৪২ সালে বিজ্ঞানী রিজেনি স্টার্ড লক্ষ্য করেন সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে সারভিক্স বা জরায়ুমুখের ক্যানসারের হার কম। যথেচ্ছ যৌন সংসর্গ, বহুবার গর্ভধারণ এবং অপরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এই ক্যান্সারে যোগসূত্র দেখা যায়। পেশাগত কারণে ক্যানসার হওয়া প্রথম চিহ্নিত করেন ব্রিটিশ শল্যবিদ ডাঃ পারসিভাল পট ১৭৭৫ সালে। সে সময় শীত প্রধান ইংল্যান্ডে ঘর গরম রাখার জন্য 'ফায়ার প্লেস' ব্যবহৃত হওয়ায় চিমনির দেয়ালে জমা আলকাতরা পরিষ্কার করার জন্য ছোট ছেলেদের কাজে লাগানো হত। তিনি দেখেছিলেন, এদের মধ্যে অণ্ডকোষের চামড়ায় ক্যানসার

হওয়ার হার অনেক বেশি। ১৮৯৫ সালে রেইন দেখেছিলেন অ্যানিলিন রঙ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে মূত্রথলির ক্যানসারের হার বেশি। পরবর্তীকালে বেশ কিছু জৈব ও অজৈব ক্যানসার উৎপন্নকারী যৌগ (কার্সিনোজেন) চিহ্নিত হয়েছে। জৈব যৌগের মধ্যে বেনজিন, নাইট্রোসোঅ্যামিনস্, পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনস ইত্যাদি। শেষোক্ত যৌগগুলি পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়ায়, কলকারখানা থেকে নির্গত ধুলো, ধোঁয়ায়, কয়লাতে, আলকাতরাতে উপস্থিত আছে। অজৈব যৌগদের মধ্যে অ্যাসবেসটস্, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, ইউরেনিয়াম ইত্যাদির যৌগ আছে। অ্যাসবেসটস কারখানার কর্মীদের মধ্যে ফুসফুস, প্লুরাল মেসোথেলিমা ক্যানসার লক্ষণীয়। আর্সেনিক দূষণ থেকে চামড়ার, ফুসফুসের ক্যানসার হয়। ইউরেনিয়াম খনির শ্রমিকদের দেহে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের কারণে ফুসফুস ও রক্তের ক্যানসারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি ত্বক ক্যান্সার ঘটায়। তাই সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদ এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। সাদা চামড়ার দেশগুলিতে বিশেষত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে ত্বক ক্যানসারের হার বেশ বেশি। কিছু কিছু ভাইরাস ও জীবাণু সংক্রমণ থেকে ক্যানসার হয়। Epstein-Barr ভাইরাস থেকে বারকিট লিম্ফোমা, হজকিন্স ডিজিজ; হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' থেকে লিভার ক্যানসার; হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে মহিলাদের সার্ভাইকাল ক্যানসার; এইচ আই ভি থেকে কাপোসিস সারকোমা, নন হজকিনস্ লিম্ফোমা ইত্যাদি হয়। জীবাণু, যেমন হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি (Helicobacter pylori) থেকে পাকস্থলীর ক্যানসার হতে পারে, যেমন ছুঁচলো দাঁতের ঘষায় জিভে বা গালে ক্যানসার হতে পারে। আয়োনাইজিং রেডিয়েশন থেকে ক্যানসার হতে পারে। ১৮৯৫ সালে এক্স-রে আবিষ্কৃত হয়। অতিরিক্ত এক্স-রের সংস্পর্শে মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ত্বক ক্যানসার ও লিউকেমিয়া হতে দেখা যায়। এরপর এক্সরে ব্যবহার বুঝে শুনে করা হতে থাকে। দেহে উপস্থিত ক্যানসার সৃষ্টিকারী অঙ্কোজিনের সক্রিয়তা ও প্রতিরোধকারী মালটিপল টিউমার সাপ্রেসর জিনের নিষ্ক্রিয়তার ওপরে নির্ভর করে শরীরে ক্যানসার হবে কি না। বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, জাত, ধনী-গরিব নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের ক্যানসার হতে পারে। তবে তুলনায় মাঝবয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। সদ্যোজাতর ক্যানসার বিরল হলেও উল্লিখিত আছে। মহিলাদের থেকে পুরুষদের মধ্যে ক্যানসারের হার বেশি। এর কারণ তাদের জীবনযাত্রা ও কিছু কু অভ্যাস যেমন ধূমপান ও তামাক ব্যবহার। শুধু মানুষ নয়, ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর, বাঘ, মাছ ইত্যাদিদেরও ক্যানসার হয়।

তামাক ও ক্যানসার একে অপরের দোসর : তামাক ব্যবহারের সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র বহুপঠিত ও বহু আলোচিত বিষয় যা এই পত্রিকাতেও আগে প্রকাশিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের নিবন্ধ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। ধূমযুক্ত ও নির্ধূম তামাক ব্যবহারের ফলে কমবেশি ১৫ রকমের ক্যানসার হয় যেমন ফুসফুসের, স্বরযন্ত্রের, মুখগহ্বরে, গলবিলের, ঠোঁটের, নাকের বিভিন্ন ক্যানসার, খাদ্যনালীর, মূত্রথলির, কিডনির, অগ্ন্যাশয়ের, পাকস্থলীর, মহিলাদের জরায়ুর, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া ইত্যাদি। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় কমপক্ষে ৪০টি সরাসরি ক্যানসার উৎপন্নকারী যৌগ সহ প্রায় ৪০০০ রকম এবং তামাক পাতাতেও বেশ কিছু কার্সিনোজেন সহ ৩০০০ রকম রাসায়নিক থাকে। বিশ্বের সব ক্যানসারের ৩৫ শতাংশ এবং ভারতে আরো বেশি ৪৫ শতাংশ এর জন্যই হয়। পৃথিবীতে এখন প্রতি বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ জন ফুসফুসের ক্যানসারে নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন ও মারাও যাচ্ছেন প্রায় সমসংখ্যক মানুষ। এর মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। এছাড়া ধোঁয়ায় উপস্থিত বেনজিন রক্তের ক্যানসার (লিউকেমিয়া) উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। ১৭৬১ সালে সর্বপ্রথম ডাঃ হিল দেখিয়েছিলেন নস্যি নিলে নাকে ক্যানসার হতে পারে। ১৯৬৪ সালে স্যার রিচার্ড পেটো ও রিচার্ড ডল অন্যদিকে আমেরিকার সার্জেন জেনারেল ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রমাণ করেন। দেখা গেছে অধূমপায়ীর তুলনায় একজন ধূমপায়ীর ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা ২০ গুণ বেশি। ধূমপানের পাশাপাশি মদ্যপানের অভ্যেস থাকলে তা আরো মারাত্মক হয় এবং এর ফলে মুখ, ফ্যারিংক্স (গলবিল), খাদ্যনালী, স্বরযন্ত্রের ক্যানসার হতে পারে। এছাড়াও অতিরিক্ত মদ্যপান লিভার, মুখগহ্বর ও পাকস্থলীর ক্যানসার ঘটায়।

ক্যানসারের নাম : আগেই বলা হয়েছে ক্যানসার অনেকগুলি রোগের এক বড়সড় পরিবার। এদের নামও বিভিন্ন যেমন আচ্ছাদক কলার : কার্সিনোমা; সংযোজক কলার : সারকোমা; রক্ত কলার : লিউকেমিয়া; লসিকা তন্তুর : লিম্ফোমা; অস্থিমজ্জার প্লাজমা কোষ : মায়লোমা; চামড়ার মেলানিন কোষের : মেলানোমা ইত্যাদি।

খাদ্যাভ্যাস ও ক্যানসার : বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহে প্রমাণ হয়েছে ক্যানসারের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং অন্ততপক্ষে এক তৃতীয়াংশ ক্যানসার প্রতিরোধ করা যায়। কোষের ক্ষতি হওয়ার থেকে রক্ষা করতে বিটা ক্যারোটিন বা প্রাক-ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি' বিশেষ উপযোগী। তাই টাটকা তরিতরকারি যেমন বিনস্, গাজর, কুমড়ো, টমেটো, রাঙা আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক ইত্যাদি এবং টাটকা ফল যেমন আম, পাকা পেঁপে, তরমুজ, আমলকি, পেয়ারা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি নিয়মিত খাওয়া ভালো। এর ফলে যে যে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে সেগুলি হল ফুসফুসের, খাদ্যনালীর, পাকস্থলীর এবং কোলন-রেকটামের ক্যান্সার। আঁশযুক্ত খাদ্যের কিছুটা ছিবড়ে থেকে যায় এবং এগুলি কোলনে-রেক্টামে মল জমতে দেয় না। তাই এই ক্যানসার প্রতিরোধ করতে আঁশযুক্ত তরিতরকারি যেমন বিনস, এঁচোড়, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, সজনে ডাঁটা, পুঁইশাক ও অন্যান্য ডাঁটাশাক উপযোগী। একটি কথা মনে রাখা দরকার আজকাল শাক সবজি, ফল ইত্যাদি চাষের সময় নানারকম কীটনাশক বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাই এগুলি ভাল করে জলে ধুয়ে নিয়ে খেতে হবে। হলুদে ক্যানসার প্রতিরোধক যৌগ কারকুমিন (curcumin) উপস্থিত থাকাতে অল্প পরিমাণে (এক-দেড় গ্রাম) কাঁচা হলুদ চিবিয়ে বা বেটে নিয়মিত খাওয়া। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণ মধু, গুড় বা চিনি খাওয়া যেতে পারে। যাঁদের অ্যাসিডিটির প্রবণতা আছে তাঁরা কিছু খাওয়ার পর হলুদ খেতে পারেন। এক সপ্তাহ হলুদ খাওয়ার পর আবার এক সপ্তাহ না খেয়ে তার পরের সপ্তাহে খাওয়া যেতে পারে। স্বল্প পরিমাণে রসুন খাওয়া যা খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধ করে (রসুনের ছোট একটি টুকরো জল দিয়ে গিলে খেয়ে নিলে মুখে কোন গন্ধ হয় না)। এ ক্ষেত্রেও এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর রসুন খাওয়া যেতে পারে। চায়ে ক্যানসার প্রতিরোধক উপাদান থাকাতে চা খাওয়া ভালো। খুব বেশি ফোটালে চায়ের উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই কেউ কেউ পাতা অল্পক্ষণ ভিজিয়ে রেখে লিকার চা খাওয়ার পরামর্শ দেন।

যে যে খাদ্যাভ্যাস ক্ষতিকর সেগুলি হল (১) আগুনে কলসানো বা সেঁকা শিককাবাব জাতীয় মাংস বা মাছের তৈরি খাবার নিয়মিত খাওয়া কারণ এগুলিতে ক্যানসার উৎপন্নকারী বিপজ্জনক নাইট্রোসোঅ্যামিনস ইত্যাদি যৌগ থাকে। (২) ছাতাপড়া বাদাম, ডাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি খাওয়া (৩) নুনে সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য

যেমন নোনা মাছ ইত্যাদি নিয়মিত খাওয়া (৬) স্নেহজাত পদার্থ যেমন তেল, ঘি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া। এতে স্তন, প্রস্টেট ও কোলন ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে।

ক্যানসারের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম, ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী। এছাড়াও শরীরের ওজনের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। স্থূলতার সঙ্গে কয়েকটি ক্যানসারের যেমন কোলনের, খাদ্যনালীর, গল ব্লাডারের, মহিলাদের স্তনের, ডিম্বাশয়ের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ক্যানসারের লক্ষণ : প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ক্যানসারের লক্ষণ 'CAUTION' এই ইংরেজি শব্দটির মাধ্যমে বিশ্বে চিহ্নিত করা হয় যাকে "সেভেন ডেনজার সিগন্যালস্ অফ ক্যানসার" বলা হয়। এই ইংরেজি শব্দটিকে ভিত্তি করে সকলের সহজে মনে রাখার জন্য "সাবধানতা স্বাগত" শব্দ দুটি গড়ে তুলেছি যা প্রতিটি লক্ষণ সম্পর্কিত বাক্যাংশের প্রথম অক্ষরটি নিয়ে তৈরি হয়েছে যেমন (১) **সা**রতে না চাওয়া ঘা (২) **ব**ক্ষে (স্তনে) বা দেহের অন্য কোথাও দলা/স্ফীতি দেখা দেওয়া (৩) **ধা**রাবাহিক অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা স্রাব যে কোনো অংশ থেকে (৪) **ন**জরকাড়া পরিবর্তন তিলে/জড়ুলে/আঁচিলে (৫) **তা**ড়াতাড়ি ওজন কমতে থাকা বা দীর্ঘস্থায়ী জ্বর অজ্ঞাতকারণে (৬) **স্বা**ভাবিক মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন (৭) **গ**লার স্বর বসে যেতে থাকা বা ঘ্যানঘেনে দীর্ঘস্থায়ী কাশি (৮) **ত**খনই খাবার গেলার অসুবিধে বা লাগাতার বদহজম। এই লক্ষণগুলির যে কোনো একটি দেখা দিলেই যে ক্যানসার হয়েছে এমন ধরে নেওয়া বা অহেতুক ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যদি লক্ষণগুলি তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং সাধারণ চিকিৎসায় না সারে তা হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন বা নিকটবর্তী ক্যানসার নির্ণয়কেন্দ্রে দেখান। এছাড়া শরীরের কোথাও যেমন ঘাড়-গলার সংযোগস্থলে, বগলে বা কুঁচকিতে কোন গ্রন্থি (লিম্ফোনোড) ফুলে উঠলে, হাড় বা অন্য কোথাও ব্যথা বেদনা দেখা দিলে, হঠাৎই মাথার যন্ত্রণা দেখা দিলে, দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন ঘটলে বা বমি হতে থাকলে, প্লীহাবৃদ্ধি, রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে সাবধান হ'ন এবং উপযুক্ত পরামর্শ নিন।

ক্যানসার ধরার পরীক্ষা : এটিও জানা প্রয়োজন কী কী পরীক্ষা করা দরকার। রোগলক্ষণহীন মহিলা-পুরুষদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরার জন্য যেসব আদর্শ পরীক্ষাগুলির সুপারিশ বিশ্বে সাধারণভাবে সবার জন্য হয় সেগুলি হল (১) প্রতি বছর মুখের ভেতর, লিম্ফোনোড, ত্বক পরীক্ষা করা; রক্তের সাধারণ পরীক্ষা ও বক্ষস্থলের (চেস্ট) এক্সরে করা (২) পঞ্চাশ বছর বয়সের পর প্রতি বছর মলমূত্রে লুকোনো রক্ত পরীক্ষা করা। মহিলাদের জন্য (১) জরায়ুমুখের 'প্যাপ' পরীক্ষা ১৮ বছর বয়সের পর প্রতি বছর একবার করা এবং পরপর তিন বছর স্বাভাবিক ফল পেলে পরে ২/৩ বছর বাদে বাদে করা (২) ব্রেস্টে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ধরার জন্য ১৮ বছরের পর থেকে প্রতি মাসে নিজে পরীক্ষা করা এবং ৪০ বছর বয়সের পরে চিকিৎসক দিয়ে বাৎসরিক পরীক্ষা করানো। পুরুষদের জন্য ৫০ বছর বয়সের পর প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (PSA) পরীক্ষা করা। উন্নত দেশগুলিতে ব্রেস্ট ক্যানসার ধরার জন্য ৪০ বছর বয়সের পর মহিলাদের বাৎসরিক ম্যামোগ্রাম করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া সবার জন্য কোলন ও রেকটামের ক্যানসার ধরার জন্য ফ্লেক্সিবল Sigmoidoscopy প্রতি ৫ বছরে এবং কোলনোস্কোপি (colonoscopy) ১০ বছরে করার কথা বলা হয়।

সূক্ষ্ম সূচ দিয়ে রোগাক্রান্ত অঞ্চলের কোষরস নিয়ে পরীক্ষা করাকে ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি (FNAC) বলা হয়। আবার আক্রান্ত অংশ থেকে কিছুটা বা পুরোটা কেটে প্রসেস করে পরীক্ষা করাকে বায়োপসি বলা হয়। এই পদ্ধতিগুলি ক্যানসার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

২০০৭ সালের কয়েকটি সাধারণ ক্যানসারের আনুমানিক বিশ্ব পরিসংখ্যান

যে অংশের	নতুন রোগীর সংখ্যা (লক্ষে)	মৃত্যু (লক্ষে)	৫ বছর বাঁচার হার (শতাংশে)
ফুসফুস ও ব্রঙ্কাস	১৫	১৩.৫	১৫ (আমেরিকা/ইউরোপ)
কোলন ও রেকটাম	১২	৬.৩	৬৪ (আমেরিকা)
পাকস্থলী	১০	৮	২৪ (আমেরিকা-ইউরোপ)
যকৃৎ	৭.১	৬.৮	<১১ (আমেরিকা)
খাদ্যনালী	৫.৩	৪.৪	১৫ (আমেরিকা)
স্তন (মহিলা)	১৩	৪.৬	৮৯ (আমেরিকা), ৭৬ (ইউরোপ)
সার্ভিক্স (মহিলা)	৫.৫	৩.১	৬৫ (উন্নত দেশে)
প্রস্টেট (পুরুষ)	৭.৮	২.৫	৯৯ (আমেরিকা), ৪০-৮০ (ইউরোপ)
শিশুদের ক্যানসার	১.৬	০.৯	৭৫ (আমেরিকা/ইউরোপ)

ক্যানসারের চিকিৎসা (১) অস্ত্রোপচার : প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি। যখন ক্যানসার শরীরের একটি অংশেই কেন্দ্রীভূত এবং ছড়িয়ে পড়েনি অস্ত্রোপচার সবচেয়ে ভাল কাজ করে। (২) রেডিওথেরাপি (বিকিরণ চিকিৎসা) : বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মাদাম কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন এবং দেখা যায় কিছু কিছু ক্যানসারদুষ্ট কোষ রেডিয়াম ধ্বংস করতে সক্ষম। আধুনিক রেডিওথেরাপি শুরু হয় ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৫ সালে টেলি-কোবাল্ট থেরাপি শুরু হয়। পরবর্তীকালে রেডিওথেরাপির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং রেডিও-আইসোটোপ ছাড়াও অন্যান্য রশ্মি সুবিধামত ব্যবহৃত হচ্ছে। (৩) কেমোথেরাপি বা ওষুধের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা : লিউকেমিয়া, লিম্ফোমার মত কিছু ক্যানসার যাতে অস্ত্রোপচার অসম্ভব সেই সব ক্ষেত্রে কেমোথেরাপিই ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও অস্ত্রোপচার বা রেডিওথেরাপি চিকিৎসার আগে পরে কেমোথেরাপি বহুল ব্যবহৃত হয় যাতে ঐ সব চিকিৎসার সুবিধা হয়। কেমোথেরাপির প্রধান সুবিধা হল ওষুধ শরীরের প্রায় যে কোন অংশেই পৌঁছতে সক্ষম অন্যদিকে প্রধান অসুবিধে হল যে দুষ্ট কোষের পাশাপাশি শরীরের সুস্থ, স্বাভাবিক কোষের ওপরেও এদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। ১৯৪৬ সালে সর্বপ্রথম কেমোথেরাপি শুরু হয়। সেই থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত কমবেশি ৮০টি ওষুধ তৈরি হয়েছে যা বিভিন্ন ক্যানসারে কার্যকর। বর্তমানে এই তিনটি মূল চিকিৎসা পদ্ধতি কখনো একসঙ্গে কখনও আলাদা ব্যবহার করা হয়।

ক্যানসার নির্ণয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র : ১৯৫০ সালে শুরু হয়ে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম পরিচালনাধীনে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট চিকিৎসা ও গবেষণাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে www.cncikolkata.org (দূরভাষ : ২৪৭৬-৫১০১/৫১০২)। ২০০৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এ রাজ্যের প্রথম ও একমাত্র তামাক ছাড়ানোর কেন্দ্র এখানেই স্থাপিত হয়েছে (দূরভাষ : ২৪৭৬-৫১০১ এক্সটেনশন ৫২১/৪১৩) যেখানে বিনামূল্যে তামাক ছাড়ার পদ্ধতির পরামর্শ পাওয়া যায়। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি হাসপাতালগুলিতেও ক্যানসার নির্ণয় ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। সত্তরের দশকে গড়ে ওঠা ঠাকুরপুকুরের ক্যানসার সেন্টার ও ওয়েলফেয়ার হোম (দূরভাষ : ২৪৬৭ ৮০০১/৪৪৩৩) প্রতিষ্ঠিত

হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে কয়েকটি ক্যানসার হাসপাতাল ও অন্যান্য সাধারণ হাসপাতালে ক্যানসারের বিশেষ বিভাগ চালু আছে। সারা ভারতে এর চিকিৎসাক্ষেত্রে সব থেকে পরিচিত ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার (দূরভাষ : ০২২-২৪১৪-৬৭৫০)। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজেরও (দূরভাষ : ৪১৬-২২৮৪২৫৫) বিশেষ সুনাম আছে। সরকারি ক্ষেত্রে অন্য নামী প্রতিষ্ঠান দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (দূরভাষ : ০১১-২৬৫৮-৮৫০০/৮৭০০)।

কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা (NGO) সুনামের সঙ্গে নানাভাবে ক্যানসার সচেতনতা বৃদ্ধি ও রোগীদের সাহায্য করে চলেছেন যেমন (১) 'অনকোলিঙ্ক', ২ সুরেন সরকার রোড়, কলকাতা-১৪(দূরভাষ : ২২২৭৬৯১৩); ৩৮/১ সুলতান আলম রোড, কলকাতা -৩৩ (দূরভাষ : ২৪২২৪৭৮৮) (২) মহিলাদের স্তন ক্যানসারের বিরুদ্ধে 'হিতৈষিণী', সি ডি - ৫৪, সেক্টর ১, সল্ট লেক, কলকাতা - ৬৪ (দূরভাষ : ২৩৩৭-৫৮১৭, ২৪৩০-৪৮০০); (৩) ল্যারিংজেক্টমি ক্লাব (Laryngectomee Club) ক্যানসার সেন্টার ও ওয়েলফেয়ার হোম, ঠাকুরপুকুর। এঁরা ক্যানসারে স্বরযন্ত্রহারাদের প্রশিক্ষণ দেন। (দূরভাষ : ২৪৬১-০০৫৮)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্যানসারের সর্বাধুনিক চিকিৎসা, গবেষণা ও তথ্য জানার জন্য কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট দেওয়া হলো যেমন (১) ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এগেনস্ট ক্যানসার : **www.uicc.org** (২) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা : **www.who.int** (৩) আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি **www.cancer.org** (৪) আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট **www.cancer.gov** প্রভৃতি।

কিছু ভ্রান্ত ধারণা : (১) ক্যানসার মাত্রেই 'নো আনসার' ভুল। বহু তথ্য থেকে দেখা গেছে এক-তৃতীয়াংশ ক্যানসার প্রায় অনিরাময় যোগ্য এবং রোগীর বাঁচার আশা বেশ কম। এর মধ্যে ফুসফুসের, খাদ্যনালীর ক্যানসার ইত্যাদি আছে। এক তৃতীয়াংশ ক্যানসার বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং রোগী বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে পারেন এবং মোটামুটি সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন। বাকি এক-তৃতীয়াংশে ক্যানসার রোগী অবশ্যই সেরে যাবেন। ক্যানসার গবেষণার উন্নতিও হচ্ছে খুব দ্রুত এবং উন্নত রোগনির্ণয় পদ্ধতিতে ধরাও পড়ছে আগেভাগে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশ যেমন আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঁচার হার ছিল ৫-১০ শতাংশ যা শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে এখন তা পৌঁছে গেছে ৬৫ শতাংশে (সব ক্যানসার ধরে)। ভারতেও নিরাময়ের হার বাড়ছে। (২) ক্যানসার রোগীর সঙ্গের বিপজ্জনক। যেহেতু ক্যানসার ছোঁয়াচে নয় তাই হাসপাতালে বা বাড়িতে রোগীর সংস্পর্শে আসার বা দেখাশোনা করার কোনো অসুবিধে নেই। (৩) এইডসের মত ক্যানসারও অসম্মানজনক। সমস্ত রোগের মত ক্যানসারেও অসম্মানের কিছু নেই। অকারণে রোগীকে মানসিকভাবে ব্রাত্য করে দেবেন না বা অহেতুক ভয় দেখাবেন না। (৪) অনেকেই ভীষণ ধূমপায়ী তাঁদের তো এই রোগ হচ্ছে না। ক্যানসার উৎপন্ন হওয়া নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষে অর্জিত অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির ওপর যা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। তাই হয়ত তিনি আক্রান্ত হন নি। বিপরীতে দেখা গেছে বহু তামাক ব্যবহারকারী অনেক কম বয়সেই এর জন্য আক্রান্ত হয়েছেন। (৫) অনেকেই মনে করেন বায়োপসি করলে রোগ ছড়াবে। এটিও ভুল ধারণা। ক্যানসার হয়েছে কিনা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে বহুক্ষেত্রেই এটি আবশ্যক।

শেষ কথা : আমাদের সকলের উচিত ক্যানসার রোগীর পাশে দাঁড়ানো এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁকে উৎসাহ যোগানো। কোনো কোনো ক্যানসারের ওষুধ প্রয়োগে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে যেমন সাময়িকভাবে চুল উঠে যাওয়া, দুর্বলতা দেখা দেওয়া ইত্যাদি। তাঁদের বোঝানো দরকার তাঁরা আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন, তাঁদের চুল গজাবে ইত্যাদি।

আসুন সবাই মিলে সচেতন হই আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

তথ্যসূত্র :

(১) Cancer Principles and Practices of Oncology, 6th Edition. 2 Volume. 2001 Editors, V.T. Devita et. al. Lippincott Williams & Wilkim, নিউইয়র্ক

(২) Global Cancer Facts & Figures 2007 American Cancer Society

(৩) Cancer Prevention & Early Detection - Facts & Figures 2008. American Cancer Society, USA. এছাড়া UICC ও WHO website থেকে তথ্যের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

ক্যানসারের বিপদ সঙ্কেত — সাবধানতা স্বাগত

১. **সা**রতে না চাওয়া ঘা

২. **বক্ষে** (স্তনে) বা শরীরের কোথাও দলা/স্ফীতি দেখা দেওয়া

৩. **ধা**রাবাহিক অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা স্রাব যে কোন অংশ থেকে

৪. **ন**জরকাড়া পরিবর্তন তিলে বা আঁচিলে

৫. **তা**ড়াতাড়ি ওজন কমতে থাকা বা দীর্ঘস্থায়ী জ্বর অজ্ঞাত কারণে

৬. **স্বা**ভাবিক মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন

৭. **গ**লার স্বর বসে যেতে থাকা বা ঘ্যানঘেনে দীর্ঘস্থায়ী কাশি

৮. **ত**খনি খাবার গেলার অসুবিধা বা লাগাতার বদহজম

অ্যান্টিক্যান্সার ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট বিভাগ

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট, কলকাতা - ২৬

ফোন - ২৪৭৬-৫১০১ (এক্সটেন.৩২৯) মোঃ - ৯৮৩০৫৫৯৪৮৩

লক্ষণগুলি ৩ সপ্তাহ স্থায়ী হলে এবং সাধারণ চিকিৎসায় না সারলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

রোগের বালাই নেই, উপসর্গের রমরমা!

জ্যোতির্ময় সমাজদার

ভদ্রলোক চেম্বারে ঢুকে, বসলেনও না, কেঁদে ফেললেন। বললেন — 'ভাল আছেন, বেশ ভাল আছেন, আমার স্ত্রী'। চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বললেন— 'সরি ডাক্তারবাবু'। এবার চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন আমার সামনে, কোলে সেই ঢাউস, নানান মেডিকেল রিপোর্টে ভরা ব্যাগটা।

অরুণবাবু নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে গেছেন তিন দিন আগে। তর সয় নি, আজ এসেছেন তাঁর শারীরিক উন্নতির ব্যাপারে রিপোর্ট করতে। অরুণ-স্ত্রী উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা (অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার) রোগে ভুগছেন।

''এই তো দুটো মাত্র ট্যাবলেট, তাতেই তিন দিনে এতটা স্বস্তি পাবে আশাই করি নি আমি। ওঃ! গত দুটো বছর কী কষ্টেই না দিনগুলো কেটেছে আমাদের। সংসারটা ডুবে যেতে বসেছিল। ব্যাঙ্গালোরে যেতে বাধ্য হলাম। ডাঃ মিত্রর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ভাগ্যিস। উনিই আপনার কাছে ভরসা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আপনি ঠিক-ই বলেছিলেন। কাটাস্ট্রফিক হেল্থ এক্সপেন্ডিচার-ই বটে। এক নিঃশ্বাসে খাপছাড়া কথাগুলো বলে, করুণ হাসি হাসলেন অরুণ।

আমার বাল্যবন্ধু ডাঃ মিত্র ব্যাঙ্গালোরে রিউমাটোলজি প্র্যাক্টিশ করে। ডাঃ মিত্রই অরুণবাবুকে আমার নামে করে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়েছেন। কলকাতায় অনেক ধরনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে ফল না পাওয়াতে অরুণবাবু পি এফ থেকে লোন নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে যেতে বাধ্য হন। ওঁর স্ত্রী গত তিন বছর ধরেই ভুগছেন কিন্তু গত এক বছরে কষ্টগুলো ভীষণ বেড়েছে। থেকে থেকেই বুকে ব্যথা, যেন কেউ বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছে। আবার কখনো ভীষণ চাপ ধরে বুকে। ব্যথার ভয়েই মাথা ঘুরতে থাকে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে ঘন ঘন। এর সঙ্গে আছে আচমকা পেশীতে টান ধরা, সারা গায়ে যন্ত্রণা। মাথা ভার হয়ে থাকে, সর্বদা ক্লান্তি। এর সঙ্গে পরে যোগ হচ্ছে তলপেটে অস্বস্তি, সাদা স্রাব, গ্যাস। রাতে ঘুম নেই।

চিকিৎসার ত্রুটি করেন নি অরুণ। হিতাকাঙ্ক্ষীরা যে যা বলেছেন তাই করেছেন। তুক্‌ তাক্‌, জলপড়ায় বিশ্বাস করেন না। ও পথে যান নি, তবে রামদেব বাবার কাছে একবার গেছিলেন। প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। ডাক্তারদের ইচ্ছে অনুযায়ী কয়েকটা দামি পরীক্ষা পুনরায় করতে হয়েছে। ব্যথার বড়ি, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম বড়ি, স্টেরয়েড, গ্যাসের বড়ি খাওয়া হয়েছে। ট্যাবলেট জমেছেও বাড়িতে অনেক, কিন্তু কষ্টের উপশম তেমন হয় নি। উল্টে দিনে দিনে হতাশা বেড়েছে, কঠিন কোনো রোগের ভয় দৃঢ় হয়েছে। মৃত্যুভয় পুরো পরিবারকে গ্রাস করছে ক্রমশ। এদিকে টাকা খরচ হয়ে চলেছে জলের মতো। দু লক্ষ টাকারও বেশি এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। সি এল কবেই ফুরিয়েছে এবার আর্ন লিভেভাগ বসেছে অরুণের। প্রথমে বসেদের সহানুভূতি থাকলেও লাগাতার গরহাজিরায় তাঁরা এখন অখুশি।

অরুণের মাঝে মধ্যেই সন্দেহ হত, সত্যিই কি তার স্ত্রীর কোনো রোগ আছে, নাকি এ তার ভান! এতদিন ধরে রোগের কেউ ভান করতে পারে! আর করবেই বা কেন! সন্দেহটা ঢুকিয়েছে বিরক্ত, হতাশ, অকৃতকার্য ডাক্তারবাবুরা। তাতে রুগী এবং ডাক্তারের সম্পর্ক তেতো হয়েছে।

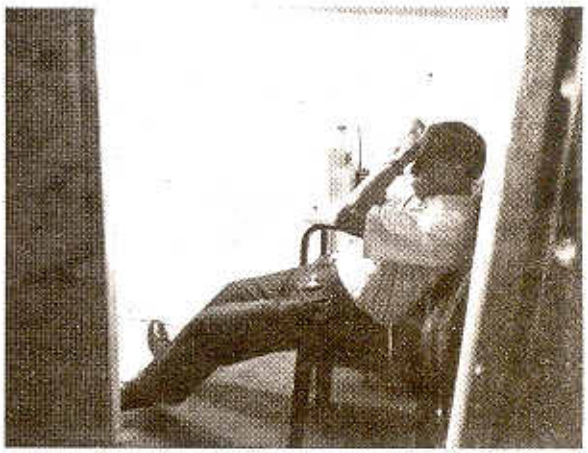

জি পি (জেনারেল প্র্যাক্টিশনার্স), ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বা পি এইচ সি (প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার)-এ, এই রকম রুগীর সংখ্যা ৩০ শতাংশ, যাদের নানা শরীরের কষ্টের (উপসর্গের) পেছনে কোনো শারীরিক রোগ (সিনড্রোম বা ডিজিজ) কারণ হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁরা দীর্ঘ দিন ভোগেন এবং ডাক্তারদের জ্বালিয়ে মারেন। শরীরের হেন অঙ্গ নেই যার কষ্ট নিয়ে এই রোগীরা আসেন না! রুগীদের এই দলটাকে ডাক্তারি জগৎ নাম দিয়েছে, এম ইউ এস (মেডিক্যালি আনএক্সপ্লেইন্ড সিমটমস) বা এম ইউ পি এস (মেডিক্যালি আনএক্সপ্লেইন্ড ফিজিক্যাল সিমটমস)। বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় 'চিকিৎসা শাস্ত্র মতে অব্যাখ্যাত উপসর্গ', সেটা রোগের চেয়েও খটমট হবে। সহজ করে ' নেই-ঠিকানা উপসর্গ' বলা যেতে পারে। এরাই জি পি-দের অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

জেনারেল ডাক্তাররা যে ভাবে ডাক্তারি করেন তা হল, শরীরের যে অংশের কষ্ট নিয়ে রুগী আসেন (রিপোর্টেড সিমটমস) তারা সেই অঙ্গের রোগ নির্ণয় করার জন্য শরীরের চেক আপ এবং মেডিক্যাল টেস্ট করে একটা কারণ খোঁজার (সিনড্রোম/ডিজিজ) চেষ্টা করেন। তারপর তাঁরা রোগের চিকিৎসা (ডিজিজ) শুরু করেন। আলাদা আলাদা করে সব কষ্টের (উপসর্গের) চিকিৎসা তাঁরা করেন না। রোগের চিকিৎসা করলেই সেই রোগের সঙ্গে যুক্ত সব কষ্টই কমে বা সেরে যায়। এম ইউ এস এর ক্ষেত্রে যে হেতু তাঁরা কোনো রোগ নির্ণয় করতে পারেন না তাই নিরুপায় হয়ে আলাদা আলাদা করে কষ্ট কমানোর কুচিকিৎসা তাঁরা শুরু করেন।

দেখা গিয়েছে* যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যত মানুষ শারীরিক কষ্ট নিয়ে আসে, তার পেছনে খুব কম মানুষেরই শরীরে রোগ নির্ণয় করা যায়।

এম ইউ এস এই নির্দিষ্ট রকম কষ্ট নিয়ে যে কেবল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেতেই

* কে ক্রোয়েঙ্কে এবং ডি ম্যাঙ্গেলসডর্ফের 'কমন সিম্পটমস ইন অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার : ইনসিডেন্স, থেরাপি অ্যান্ড আউটকাম'

** ক্রিডম্যান, কাপলান ও সাডক 'সিনপসিস অফ সাইকিয়াট্রি, ৮ম সংস্করণ, উইলিয়ামস অ্যান্ড উইলকিন্স ১৯৯৮ : ৬১২।

ভিড় করেন তা নয়, নির্দিষ্ট কষ্ট নিয়ে নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বারেও তাদের যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।**

তাহলে এম ইউ এস নিয়ে যাঁরা ডাক্তারের দোরে দোরে ঘুরছেন এবং সি টি স্ক্যানের মতো দামি পরীক্ষা বা সাধারণ রক্ত পরীক্ষায় যাঁদের রোগ ধরা পড়ছে না, এঁরা তা হলে কী রোগে ভুগছেন?

এটা এখন স্পষ্ট যে এম ইউ এস-এর বেশির ভাগ রুগীই আসলে বিষণ্ণতা (মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার) বা উদ্বেগের রোগে (অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার) ভুগছেন। বর্তমান পৃথিবীতে এই রোগেই বেশির ভাগ মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন।

নিচের সারণি ১ এবং ২ তে বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ রোগের লক্ষণগুলি দেওয়া হল। বিষণ্ণতা আক্রান্ত প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষের মধ্যেই বিষণ্ণতার রোগ লক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের এবং উৎকণ্ঠার লক্ষণও মিশে থাকে। বিষণ্ণতা, উৎকণ্ঠা মানুষ শরীর দিয়েই প্রকাশ করে। মনের রোগেও আসলে শরীরেই কষ্ট নিয়েই ডাক্তারের কাছে আসে মানুষ।

সারণি - ১

তীব্র বিষণ্ণতা (মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার)

এই তীব্র বিষণ্ণতার লক্ষণগুলির স্থায়িত্ব অন্তত পক্ষে দু-সপ্তাহ এবং লক্ষণগুলি বারে বারে ফিরে আসে (episodic)। একবার যার এই রোগ হয়, তার জীবনে অন্তত চার থেকে ছয় বার তীব্র বিষণ্ণতার আক্রমণ ঘটতে পারে। প্রথম দিকেই যদি চিকিৎসা না শুরু করা যায় তাহলে আত্মহত্যার আশঙ্কাও থাকে।

সাধারণভাবে তীব্র বিষণ্ণতার লক্ষণগুলি হল :

- মন খারাপের তীব্র অনুভূতি
- অত্যধিক রাগ, আক্রমণাত্মক আচরণ (কিছু কিছু ক্ষেত্রে)
- অল্পতেই কান্না পাওয়া
- অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায় অনিচ্ছা, চুপ করে একা একা বসে থাকতে ইচ্ছে করে
- কোনো কিছুতে মনঃসংযোগে (কনসেনট্রেশন) অসুবিধে, ভুলে যাওয়া
- সাজপোশাক বা নিজের চেহারার দিকে একেবারেই নজর থাকে না
- এনার্জির অভাব, একটুতেই ক্লান্তি—কোনো কাজ করতে তীব্র অনীহা—প্রায় সবসময়ই শুয়ে বা বসে থাকতে ইচ্ছে করে
- খিদে আর ঘুম স্বাভাবিক থাকে না—খেতে ইচ্ছে করে না
- তীব্র হতাশা — সবকিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়
- নিজেকে অপদার্থ বলে মনে হয়— বিনা কারণে বা সামান্য কারণেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়
- অ্যালকোহল বা অন্য কোনো মাদকদ্রব্যে আসক্তির প্রবণতা
- বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে যায়—আত্মহত্যা ও নানাভাবে মৃত্যু চিন্তা আসে মনে
- কখনো কখনো অস্বাভাবিক স্থবিরতা দেখা যায়
- কিছু ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন — অর্থাৎ অস্তিত্বহীন কিছু অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয় ('আমার মৃতা মা আমাকে ডাকছে'—এই জাতীয় কথা ভেসে আসার অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে)।

তীব্র বিষণ্ণতায় আক্রান্ত নারীর সংখ্যা পুরুষদের দ্বিগুণ।

অন্তত পঁচিশ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশগত কোনো দুঃখজনক ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পর এই রোগের সূত্রপাত হয়। যে কোনো বয়সেই এই অসুখ হতে পারে। তবে চল্লিশের (মাঝবয়সী) কাছাকাছি বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। বংশগতির একটি ভূমিকা এই রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

সারণি - ২

উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা (মিক্সড অ্যাংজাইটি ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার)

বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ এই দুই রোগেরই বেশ কিছু লক্ষণ একই সঙ্গে বহু মানুষের মধ্যে দেখা যায়। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের মধ্যেই বিষণ্ণতার রোগ লক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার লক্ষণও মিশে থাকে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যে লক্ষণগুলি সাধারণত দেখা যায় :

শারীরিক লক্ষণ	মানসিক লক্ষণ
• হাত-পা কাঁপা, কাঁকুনি	• ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি
• আচমকা পেশিতে টান ধরা	• কোনো কিছুতে মনোযোগ না দিতে পারা
• পেশিগুলি শক্ত বা টানটান হয়ে আসা	• ভুলে যাওয়ার প্রবণতা
• মাথাব্যথা, পিঠে যন্ত্রণা	• অস্থিরতা, বিরক্ত হওয়া
• শ্বাস নিতে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসের লয় দ্রুত হওয়া	• অস্বস্তিকর অনুভূতি
• ক্লান্তিবোধ, মুখ শুকিয়ে আসা	• অতিরিক্ত সতর্কতা
• কথা আটকে যাওয়া	• হঠাৎ ডাকলে চমকে ওঠা
• হোতলামির লক্ষণ ফুটে ওঠা	• নিরাপত্তাবোধের অভাব
• গলায় কিছু আটকে থাকার অনুভূতি	• নিজেকে অসহায় ভাবা
• মুখের রঙ ফ্যাকাসে বা লাল হয়ে ওঠা	• নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করা
• কান গরম হয়ে যাওয়া	• আতঙ্ক এবং উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা
• হাত ও পায়ের পাতা ঘামতে থাকা, ঠাণ্ডা হয়ে আসা	• সম্ভাব্য দুর্ঘটনার আশঙ্কায় একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়ে সেই অনুযায়ী আচরণ করা
• ডায়েরিয়া বা পেটের মধ্যে অস্বস্তিবোধ	• ঘুম আসতে দেরি হওয়া প্রভৃতি
• বমি বমি ভাব/ গা গোলানো, বমি পাওয়া	
• ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া প্রভৃতি	

হবে একথা মনে রাখা দরকার, ওপরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার এই লক্ষণগুলি উদ্বেগ-আক্রান্ত সব ব্যক্তির মধ্যে একই রকমভাবে দেখা যায় না। কিছু কিছু লক্ষণই একজন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, সবগুলি নয়।

মন এবং শরীরের চিকিৎসা সংক্রান্ত সত্য গত কয়েক দশক ধরে হু (ডব্লিউ এইচ ও) ডাক্তারদের সামনে রাখা সত্ত্বেও তাঁরা এই এম ইউ এস-এর চিকিৎসা কেন করতে পারছেন না? মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছেই বা পাঠাচ্ছেন না কেন? পাবলিক মেন্টাল হেল্‌থ এই তথ্যগুলো ক্লিনিক্যাল মেডিসিনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সরকারি নীতিনির্ধারকদের রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবই এর প্রধান কারণ। এরই ফলে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং-এ মানসিক রোগ চিকিৎসার গুরুত্ব এত কম। সম্প্রতি এর গুরুত্ব সামান্য বাড়লেও পর্যাপ্ত নয়।

চিকিৎসা প্রশিক্ষণের সময় আমাদের স্যারেরা একটা কথা প্রায়ই বলতেন— 'What your mind does not know your eye cannot see.'

অর্থাৎ এম বি বি এস পাঠক্রমে যদি সাইকিয়াট্রি বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে না পড়েন তবে পরে পারদর্শিতার সঙ্গে তার চিকিৎসা করতে পারবেন না। ভাসা ভাসা জ্ঞানের জন্য ওষুধের মাত্রা অপর্যাপ্ত হবে এবং রোগের কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে রুগীকে কোনো ধারণা দিতে পারবেন না। কী ভাবে রুগীকে বুঝিয়ে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হয় তাও শিখতে হয়। তার এই অশিক্ষা গরিব রুগীর কষ্ট এবং চিকিৎসা খরচ বাড়িয়ে তুলবে।

নিউরোলজিস্টদের কাছে মাথাব্যথা এবং ক্লান্তি শ্রেফ এই দুটো কষ্ট নিয়ে রুগীর সংখ্যা সব থেকে বেশি। উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত রোগীরা সবাই 'মার্ভ'-এর ডাক্তার দেখাতে চান। অথচ দুঃখের হলেও এটা সত্যি নিউরোলজিস্টদের সাইকিয়াট্রিক ট্রেনিংয়ের মান ভাল নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা DALY (Disability Adjusted Life Year) মানদণ্ডে মেপে দেখিয়েছেন মানসিক রোগের প্রতিবন্ধকতা তৈরির ক্ষমতা সব রোগের থেকে বেশি ২৪ শতাংশ। স্নায়ুরোগ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে মোটে ৪ শতাংশ। নিউরোলজিস্টদের কাছ থেকে সাইকিয়াট্রিতে রোগী পাঠানোর সংখ্যা বেশ কম। যদিও ৯ জানুয়ারি ২০০৭-এ কোলকাতার বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি এবং ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি, পৃথিবীর বর্তমান ধারা মেনে এক করে দেওয়া হয়েছে, তবু 'মার্ভ'-এর ডাক্তারদের, 'পাগলের' ডাক্তারদের প্রতি এই অনীহা এবং অবজ্ঞা কমে নি। যে হেতু মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে মানুষের মনে এত বাধা (স্টিগমা), তাই যে ডাক্তার মানুষটিকে মনচিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন তাঁর নিজের মনোরোগের প্রতি স্টিগমা না কাটলে প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি রোগী পাঠাতে পারবেন না।

ডাক্তারদের উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা চিকিৎসা না করতে পারার পেছনে অপর্যাপ্ত ট্রেনিং এবং ফলে ভ্রম জোর নানা অজুহাত। যেমন তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন 'আমার এত রুগী আর এত ব্যস্ততার মধ্যে ডিপ্রেসড রুগী দেখব কখন? অথচ বিষণ্ণতা চিনতে, টি বি, হার্ট ফেইলিওর এবং ডায়াবিটিসের থেকে কম সময় লাগে।

একজন বিষণ্ণতা-উদ্বেগে ভোগা রোগীর ইতিহাস মোটামুটি এ রকম — শরীরের কষ্টে গড় ৩ মাস ধরে ভুগছেন অথচ তাতে কোনো বিরাট ক্ষতি হয় নি। শরীরের কষ্ট অন্তত ৩টে বা তার বেশি অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকজন ডাক্তার বদল হয়েছে। রুটিন মেডিক্যাল পরীক্ষায় কোনো রোগ পাওয়া যায় নি অথচ কষ্ট বেড়েই চলেছে, কর্মক্ষমতা কমে গেছে। যত্ন নিয়ে প্রশ্ন করলে জানা যাবে রোগী ভীষণ মানসিক চাপে রয়েছেন।

গরিব দেশের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার এই অপারদর্শিতা এবং অসংগতির ফলে সরকারের এবং মানুষের পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে। হু এর একটা গান ভরা নাম দিয়েছে 'ক্যাটাস্ট্রফিক হেল্‌থ এক্সপেন্ডিচার'। সে আলোচনা পরে কখনো করব। লেখা শেষ করি ল্যান্সেট পত্রিকা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক পরামর্শ দিয়ে।

Mental health

THE LANCET

"Mental health awareness needs to be integrated into all aspects of health and social policy, health-system planning, and delivery of primary and secondary general health care."

Health Care

এই পরামর্শ হু এবং ভারত সরকারও মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর? মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনায়, প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে, প্রয়োজন শুধু সমন্বয় সাধনের।

তথ্যসূত্র :

1. Designing Health Financing Systems To Reduce Catastrophic Health Expenditure -Technical Briefs for Policy-Makers. WHO / EIP/ HSF/ PB/ 05.02.

2. The LANCET. Global Mental Health. September, 2007.

3. www. globalmental health. org.

4. WHO (1996) ICD-10 Diagnostic and Management guidelines for Mental Disorder in Primary Care. WHO / Hogrete & Hurbar Publishers, Gottingen, Germany.

5. Merging neurology with Psychiatry, for Patients' sake. The Statesman. wednesday, 10 January 2007.

6. A Physician's Guide to Medically Unexplained Symptoms. Dr. Vikram Patel, Dr. Asit Sheth. SANGATH, Goa, India.

7. বিষণ্ণতা একটি অসুখ, মন ফাউন্ডেশন, ডি আই পি রোড, কোলকাতা - ৪২। monfondation@yahoo.com

8. The World Health Report 2001, Mental Health : New Understanding, New Hope, p. 30.

স্বজন-বিয়োগ

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো

পবন মুখোপাধ্যায়

জুলাই, ২০০৯ শনিবার সকাল ৬.১০-এ মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা, একনিষ্ঠকর্মী, সংগঠক ও 'মানস' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অমল সোম প্রয়াত। জন্ম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৫। দীর্ঘ বহর খানেক ক্যান্সারের মত জটিল রোগে ভুগছিলেন। অমল সোম রেখে গেলেন স্ত্রী দীপ্তি সোম-মুখোপাধ্যায়, অগুন্তি বন্ধু। মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের অসংখ্য সাথী, মানসিক রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের। যাঁরা একান্তভাবে তাঁর গুণগ্রাহী অকৃত্রিম বন্ধু।

অমল সোম ছিলেন পদার্থ বিদ্যার কৃতী ছাত্র। পেশায় নিষ্ঠাবান শিক্ষক। নেশায় মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী। ইচ্ছে করলে হতে পারতেন সেতার শিল্পী অথবা গায়ক। এ প্রসঙ্গে জানাই 'অন্তরা'তে (মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র) কিছুদিন অমল দা মানসিক রোগীদের গান বাজনার মাধ্যমে (মিউজিক থেরাপি) কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এটি ছিল পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা মাত্র। দুটোতেই অসামান্য পারদর্শী ছিলেন তিনি।

সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে ভিড়ে গেলেন মনোরোগের মত জটিল চিকিৎসার আলো-আঁধারি জগতে। প্রেক্ষিতটা তৈরি হয়েছিল পরিবারের নিকট সদস্যের মানসিক অসুস্থতায়। নিজের চোখে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন মনোরোগীর কষ্ট-বেদনা। পরিবারের অন্য সদস্যদের রোগীকে ঘিরে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, সংশয়। প্রতিদিনের অশান্তি উদ্বেগ। দেখেছেন রোগীর প্রতি কখনো দোষ কখনো ভালবাসা। আস্তে আস্তে সময়ের আবর্তে মনোরোগীকে ঘিরে একটা পরিবারের দুমড়ে মুচড়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া সংসার। হতাশায় নিমজ্জিত পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। একটা নয়, দুটো নয়, বহু পরিবারের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত মানুষ অমল সোম। সমাজের পাগলরা (!) একটা আপদ, নিষ্কর্মা, আবর্জনা। সামাজিক সহানুভূতির বদলে উপেক্ষা, অনাদর, বাতিল একটা মানুষ। মানসিক রোগীদের প্রতি এই অবজ্ঞা, অবিবেচনা, অমানসিকতা অমল সোমকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। আত্মজনন হয়েছে। দেখেছেন মানসিক রোগের চিকিৎসা মানে ওষুধ-শক-ডাক্তারবাবু-হসপিটাল-নার্সিংহোম-বাড়ি। আবার বাড়ি-ওষুধ-শক-ডাক্তারবাবু-হসপিটাল-নার্সিংহোম। এক জটিল আবর্তে ঘুরে ফেরা। মানসিক রোগীদের এই চিকিৎসা পদ্ধতি অমল সোমকে কোনো ভরসা-আশা জোগাতে পারেনি। তিনি মনে করতেন এর বাইরে একটা সামাজিক উদ্যোগ, সহানুভূতি, মনোরোগী সম্পর্কে সামাজিক চেতনার বস্তাপচা ধারণাগুলো ভাঙা দরকার। দরকার মনোরোগ-মনোরোগী সম্পর্কে বয়ে-চলা কুসংস্কারের শতাব্দী প্রাচীন চিন্তাগুলোকে আঘাত হানা।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ ....

ছুটেছেন বন্ধুদের কাছে। কাছের মানুষদের কাছে। আর্জি নিয়ে, তাগিদ নিয়ে এই সব ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে কিছুর আশার আলো দেখানো যায় কিনা। একটা সংগঠন, একটা উদ্যোগ। বহুমানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠা একটা প্রয়াস।

বন্ধুরা তাঁর কথা শুনে কেউ অবাক, কেউ বিস্মিত। পাগলামি একটা সামাজিক সমস্যা, সংগঠন গড়ার ভাবনা হতে পারে তাদের চিন্তায় চেতনায় সেভাবে লালিত নয় এই ভাবনা। বন্ধুদের কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাবে বলে মনে হয়েছিল কার্যত ততটা পেলেন না। কিন্তু নাছোড় বান্দা অমল। প্রবল জেদ নিয়ে আবার মিটিং ডাকলো অভিজিৎ লাহিড়ীর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে। সালটা ১৯৮১ সালের প্রথম দিক। যাঁর এত আবেগ, জেদ প্রত্যয় সেই তো পারে একজন সংগঠক হতে। তৈরি হলো 'সৃজনী', মানসিক রোগীদের ও তাদের পরিবারের লোকজন ও বন্ধুদের একটি সংস্থা। পাশে এসে দাঁড়ালো 'উৎস মানুষ', বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর মত সংগঠন।

অমল সোম মনে করতেন, "আমাদের মধ্যে যারা পাগল নই, তাদের পরিবারের লোকজন নই, পাগলের ডাক্তারও নই, পাগল সমস্যায় তাদের কি কোনো ভূমিকা পালনের আছে? এর উত্তরে প্রথমেই (অর্থাৎ মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) ওষুধ ইলেকট্রিক শক, হাসপাতাল-নার্সিংহোম ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বাইরে ও ওপরেও সাধারণ মানুষদেরও বেশ কিছু করণীয় আছে ও যেগুলো করতে গেলে কোনো পাগল বিশারদ হবার প্রয়োজন হয় না। (সূত্র : পাগল সমস্যা-কিছু প্রশ্ন, কিছু প্রস্তাব)। পরবর্তী সময়ে রেজিস্ট্রেশনজনিত জটিলতায় 'সৃজনী' নামের পরিবর্তে 'মানস' নামকরণ হলো।

'মানস'-এর কোন স্থায়ী ঘর ছিল না, দপ্তর ছিল না। ঠিকানা বলতে ২৩৯এ কিম্বার স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস, অমল সোমের বাড়ি। প্রতিষ্ঠানের যত ঝক্কি সামলাতে হয়েছে অমল সোম ও দীপ্তি সোমকে।

এছাড়া সপ্তাহে দু'দিন ক্লিনিক বসত পার্ক সার্কাসের ১৭বি মনোরঞ্জন রায়চৌধুরি রোডের মডার্ন স্কুলে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার। বিকেল ৪টে থেকে ৬টা। মানস রিক্রিয়েশন ক্লাব চলত শনিবার বিকেল ৫টা থেকে ৭টা। মনোরোগীদের জন্য মানসের মনোরঞ্জনের আসর। মঙ্গলবার মানস কাউন্সিলিং সেন্টার সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৮টা। মানসের স্বেচ্ছাসেবীরা রোগী ও তার পরিবারের লোকজনদের সাথে বসে সমস্যা নিয়ে আলোচনা। মাঝে মাঝে আলোচনা চক্র। এভাবে চলছিল মানসের কাজ।

কিন্তু অমল সোমের মাথায় রয়েছে অন্য রকমের আর এক পাগলামি। মনোরোগীদের জন্য পুনর্বাসন ও মুক্ত আবাসন। সেটা নয় জেল, খোঁয়াড়, নার্সিংহোম, হাসপাতাল, ডে কেয়ার। "একটা জায়গা দিতে পারেন?" 'ক্রনিক পাগলের জন্য আমাদের দেশে কোনো স্থায়ী পুনর্বাসনমূলক আবাস

বা কেন্দ্র নেই। তাই কিছু কিছু অভিভাবক এই রকম পাগলদের নিয়ে জর্জরিত হতে হতে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে (অথবা প্রেফ দায় এড়াবার জন্যেও) হাসপাতালগুলোতে প্রথমে রোগীকে পেয়িং বেডে ঢুকিয়ে তারপর ফ্রি বেডের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে (অনুমতি পেয়ে গেলে) রোগীটিকে চিরকালের জন্যই ত্যাগ করে আসেন হাসপাতালে। দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির লোকজন যেন উবে যান। তারা রোগীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখেন না। সেরে উঠলেও বছরের পর বছর হাসপাতালেই পচে মরে রোগী। (সূত্র পাগল সমস্যা)

আবার বন্ধুদের, সহযোগী সাথীদের দ্বারে দ্বারে কড়া নাড়া। একটা জমির খোঁজ পাওয়া গেছে। ওটা কিনতে হবে। সে জমি নিয়েও অন্য ভাবনা। জমি কিনবে তারাই যারা মানসের সাথী, সহযোগী, মানস ভাবনার পরিপন্থী। তারা ঘিরে থাকবে, বসবাস করবে মানসকে ঘিরে। মানসের নিজস্ব জমির চারপাশে একটা মানবিক সহযোগী বন্ধুদের পাঁচিল। মানসের স্থায়ী কেন্দ্র হল মদনপুর, তেঘড়িয়াতে। মানসের নিজস্ব ১৬ বিঘা জমিকে ঘিরে থাকল ৫ বিঘা জমির ছোট ছোট প্লটে মানসের বন্ধু, রোগীর পরিবার ও সহযোগী সাথীরা। মানস ভাবনার কাজ শুরু হল মদনপুরকে ঘিরে। অমল সোমের মননে ছিল সেটা জেল নয়, হাসপাতাল নয়, নার্সিংহোম নয় প্রথার বাইরে গিয়ে কোথাও একটু অন্যভাবে, অন্যভাবনায় আশ্রয় খোঁজা, আশ্রয় গড়া। প্রকৃতির কোলে মনোরোগীর স্বাভাবিক জীবনচর্চার একটা 'আশ্রম' গড়া। 'আশ্রম' কথাটা অমল সোম খুব পছন্দ করতেন। তেমনিও অপছন্দ করতেন মানসের আঙিনায় 'হাসপাতাল' কথাটা।

সারাজীবন মন, মানসিক রোগী, মানবিক সম্পর্ক, মনোরোগ, ওষুধ নির্ভর মানসিক চিকিৎসা, মনোরোগের পুর্নবাসন ও সংগঠনকে নিয়ে টুকরো টুকরো নোট, নির্দেশ, রচনা লিখেছিলেন। যদি কখনো কারো কাজে লাগে। না, নিজের নাম জাহির করে বই লেখা বা নিজের নাম খোদাই করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। লিখতে খুব ভালবাসতেন। বাংলা লিখতেন খুব সাবলীল সহজ ভাষায়। সে কথা মনের অন্তরালে কোথায় গিয়ে যেন অনুপ্রাণিত করে আক্ষেপকে চাগিয়ে দেয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মানসের বন্ধুদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বিশেষ করে রেখা, ভাস্কর, অমিত ও রবীন চক্রবর্তীর অসম্ভব প্রয়াস ও পরিশ্রমে এ বছর বইমেলায় অমল সোমের মানস ভাবনার এক অনবদ্য দলিল 'ঘরেও নহে পাড়েও নহে'। প্রকাশিত হল। অমলদা মৃত্যুর আগে তারই পরিশ্রমের ফসল নিজে হাতে পরখ করে যেতে পারলেন এ আমাদের বড় তৃপ্তি।

অমল সোম শুধু 'মানস' নিয়ে চিন্তিত, ভাবিত ছিল এমন নয়। ১৯৯২ সালে প্রয়াত ডা. কে. এল. নারায়ণন, টমাস জন, জয়শ্রী শ্রীমানিকে নিয়ে তৈরি করলেন 'ফোরাম ফর মেন্টাল হেলথ্ মুভমেন্ট'। উদ্দেশ্য একই ছাতার তলায় বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সংগঠনগুলোকে জড়ো করে মানসিক রোগীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া, পরিষেবার অপ্রতুলতায় সরকারের নজর কাড়া। সরকারকে চাপে রাখা, সমালোচনা করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি সংগঠনের মধ্যেকার রিসোর্সগুলোকে একে ওপরের জানা। একটি সংগঠন না করলে সবাই মিলে একটি রোগীকে রোগীর পরিবারকে সাহায্য করা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। অমল সোম নিজের অজান্তে তৈরি করে ফেলেছিলেন বহু স্বেচ্ছাসেবী মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী। এরা কোন প্রথাগত ডিগ্রিধারী নয়, এদের কৌলিন্য নেই, নেই পদমর্যাদা। এরা ভালবেসে, ভাল লাগার তাগিদ অনুভব করে মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী হয়ে গেছেন এগিয়ে এসেছেন মনোরোগীদের সাহায্যে, সহায়তায়।

অমল সোম ছাড়া মানস ভাবনার উদ্যোগ ভাবাই যায় না। এমনভাবে অমল সোম আর মানস জড়িয়ে ছিল যা দেখে অমলের বন্ধু সাথীরা ঠাট্টা করে বলতেন 'মানস সোম'। যথার্থ তাই।

সেই অমল সোম আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু রয়ে গেল তার মানস ভাবনার ফসল, স্বপ্ন। অমল সোমকে স্মরণ করা তখনই যথার্থ হবে যখন আমরা অমলদার মানস ভাবনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

অন্য মানুষ

অমলেন্দু চক্রবর্তী

জন্ম - ৩১/১২/১৯৩৪

মৃত্যু - ১৫/৬/২০০৯)

বরুণ ভট্টাচার্য

চেতনার প্রথম বিজ্ঞানমেলার (১৯৮৯-৯০) উদ্বোধন করতে এসে পান্নালাল দাশগুপ্ত বলেছিলেন — "ক্ষুদিরাম বসু রোডের ফুটপাথে যখন দরমার বেড়া দেয়ে ঘর উঠল আমি ভাবলুম, কয়েকদিন পর টি.ভি. ঢুকবে আর সাইনবোর্ড ঝুলে যাবে। কিন্তু এই বয়সেও আমার ধারণা মিথ্যে করে দিয়ে 'চৈতন্য' বা 'চেতনা'র উদয় হল।"

অবিশ্যি চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থার (লোকে যাকে 'হাতিবাগানের চেতনা' বলে একডাকে চেনে) পথ চলা শুরু তারও বছর ছয়েক আগে।

চেতনার এই সজীব ধারাবাহিকতাকে আগাগোড়া শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছেন — আমৃত্যু — বয়সে প্রবীণ এই মানুষটি। অমলেন্দু চক্রবর্তী। চেতনার সবার 'অমলেন্দুদা'। আগলে রেখেছেন সন্তানসম যুবক যুবতীদের স্নেহের ছায়ায়, উৎসাহের আতিশয্যে বেপথু না হবার শিক্ষা দিয়েছেন 'অমলেন্দুদা'।

চেতনার অনুষ্ঠানে নিজের সাহিত্য যশকে আড়ালে রেখে পরিচিত হয়েছেন চেতনার একজন হিসেবে। কপট গাম্ভীর্য নয়, সরল হাসিভরা মুখের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি — বড় বেমানান লাগে চেতনার মত সংগঠনের কর্ণধার কিনা এমনই এক স্বীকৃত সাহিত্যিক যিনি পুরস্কার পুরস্কার নিয়ে এলিটিস্ট কায়দায় সাহিত্য সভা আলো করে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারতেন। সেটাই তো অঙ্কের হিসেব। সে পথে হাঁটেন নি শ্রদ্ধেয় এই মানুষটি। হাতিবাগান অঞ্চলে 'উৎস মানুষের আড্ডার' অন্যতম 'আড্ডাবাজ' অমলেন্দু চক্রবর্তীর প্রয়াণ তাই আমাদের কাছ থেকে আরো এক ভালো মানুষকে কেড়ে নিল।

একটি প্রতিবেদন—

ক্রীড়া উৎসব — একটা ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন

১৯৮১ সালের গোড়ার কথা, 'উৎস মানুষ' পত্রিকা সবে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। হরিণঘাটা বাজার এলাকার আশপাশের যে কয়েকজন এই পত্রিকাটি রাখতাম তাদের কয়েকজন মিলে 'উৎস মানুষ' পাঠচক্র গড়ে তোলা হল। উদ্দেশ্য — পত্রিকার বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝা। পাঠচক্রে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি কীভাবে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে করা যায় সে সম্পর্কেও আলোচনা, মত বিনিময়, বিতর্ক হত। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, মরণোত্তর কাজকর্মের রূপ কী হওয়া উচিত এ নিয়ে আলোচনা হত। এলাকার প্রচলিত প্রথার পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠান এবং অনেকগুলি মরণোত্তর স্মরণসভা এই পাঠচক্রেরই আলাপ আলোচনার ফসল। সামাজিক উৎসবাদির ক্ষেত্রে পাঠচক্রের ভাবনা হল আমাদের ধর্মকেন্দ্রিক উৎসবগুলি যেমন পুজোপার্বণ, ঈদ-মহরম, বড়দিন ইত্যাদি যতই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হোক না কেন এগুলো মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীরকে পাকাপোক্ত করে। অথচ উৎসব আমাদের চাই। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পরে আমরা একটা সহজ সমাধানে পৌঁছই। প্রতিটি মানুষ শরীর ও মনের সমন্বয়ে তৈরি। আমাদের উৎসবগুলিও শারীরজগৎ ও মানসিক জগৎকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। শারীর জগতের উৎসবগুলি হল বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা এবং মানসিক জগতের উৎসব হল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যা মনের বিকাশ সাধন করে। পাঠচক্রের শারীর জগৎ সম্বন্ধীয় উৎসব ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসে নারায়ণপুর গ্রাম। ১৯৮২, একদিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠান হল নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট খেলার মাঠটিতে; দৌড় প্রতিযোগিতাগুলি হত মেঠো রাস্তায়, তাৎক্ষণিক ভাবে সাইকেল, ভ্যানরিক্সা দাঁড় করিয়ে রেখে। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষ হল। গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট হল যে কোনো বয়সী যে কোনো লোক — শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সমস্ত গ্রাম মাঠে এসে জড়ো হয়েছে। প্রথম দুবছর 'নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা' এই নামে ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক অংশগ্রহণ দেখে মনে হল 'প্রতিযোগিতা' শব্দটা বেমানান। ১৯৮৪ সাল থেকে 'উৎসব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে হরিণঘাটা এলাকার উত্তর রাজাপুর, মোয়াবেলিয়া, সুবর্ণপুর, সুকান্ত পল্লী, গাঙ্গরিয়া, লাউপালা, ভাতশালা, সিমহাট, বড়জাগুলী প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঐ উৎসবকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ২০০৭ সন থেকে আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু হয়েছে। যে সকল এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠান সংগঠিত হয় কেবলমাত্র সে সকল এলাকার অধিবাসীরাই আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, রবিবার সুকান্ত পল্লীর দিশারি ক্লাবের উদ্যোগে ও অন্যান্য গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটিগুলির সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব হল। উদ্বোধনে ছিলেন চন্দন সরকার, প্রধান শিক্ষক লাউপালা কল্পতরু উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটির আবেদন ক্রমে আন্তর্গ্রামীণ উৎসব কমিটি আগামী বছরের উৎসব সংগঠিত করার দায়িত্ব উক্ত কমিটির ওপর অর্পণ করে এবং তারই প্রতীক হিসাবে অলিম্পিকের ধাঁচে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটির পতাকা নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটির হাতে স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মধ্য দিয়ে অর্পণ করে। অবশেষে দিনভর ক্রীড়া উৎসব আগামী বছরের এই দিনটির দিকে তাকিয়ে শেষ হয়।

গ্রামীণ ও আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা মূলত এলাকার জনসাধারণের ওপর নির্ভরশীল। পঞ্চায়েতের কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য আমরা কোনো কোনো সময় চেয়ে থাকি। পঞ্চায়েত সময় সময় অর্থ সাহায্য করে আমাদের উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণে সাহায্য করে থাকে।

ক্রীড়া উৎসব আমাদের সামনে কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা তুলে ধরেছে। সেগুলি হল : (১) একটা খেলার মাঠ এলাকার সব লোককে একত্র করতে পারে এ সত্যটা ক্রীড়া উৎসবের সাথে যুক্ত না থাকলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। (২) মহিলারা ক্রীড়া উৎসবে সবচেয়ে বেশি মনের খোরাক পান, এটা দর্শক হিসাবে তাঁদের উপস্থিতি এবং খেলায় অংশগ্রহণ করার সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। (৩) বর্তমান সময়ে আত্মকেন্দ্রিক জীবনস্রোতের প্রাবল্যের বিপরীতে সমষ্টিকেন্দ্রিক এই ক্রীড়া উৎসবের বিকাশ একান্ত প্রয়োজন।

— নিরঞ্জন বিশ্বাস

হরিণঘাটা আন্তর্গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি

WB/EC 228 | ISSN 0971-5800 | R.N. 37275/80 | Rs. 15.00
UTSA MANUSH | 29th Year | JULY 2009 | ১৫টাকা

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড) সংকলন	৩৫.০০
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (জানু ১৯৯৫) ১ম সংকলন	৩০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বনধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন সংকলন	৩০.০০
'আমরা জমি দেইনি, দেব না'	১০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০

প্রকাশিত, বর্তমানে ছাপা নেই

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
প্রমিথিউসের পথে (চতুর্থ ৯৮)
জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? (৩য় প্রকাশ)
শেকলভাঙা সংস্কৃতি—৪
হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
সংকলন
কী আর কেন
চলতে ফিরতে
বিজ্ঞানকে মুখোশ করে
বিবেকানন্দ অন্য চোখে (তৃতীয় ৯৫)
ঐ: আরো কিছু বিতর্ক (তৃতীয় ৯৫)
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারী ২০০০, ১ম)
খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়)
লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (২য়)
নিজের মুখোমুখি : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
হেজিমিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎস মানুষ
বি. ডি. ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪
ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮, ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২, ২৫৩১০৯১৩
ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com

প্রাপ্তিস্থান

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক (কলেজ স্কোয়ার পূর্ব), র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, অমর কোলে (বিবাদীবাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন, সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়) কেদার মোদক (শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়, সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)

মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৯০, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত ... ০০৯ এবং ২হাঁতে মুদ্রিত